Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আহলে কুরআন সম্পর্কে আলোচনা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আব্দুর রহমান খান

রোলঃ ২১৬০১০৩২৫

২ জুন, ২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আহলে কুরআন সম্পর্কে আলোচনা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আব্দুর রহমান খান

রোলঃ ২১৬০১০৩২৫

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "আহলে কুরআন সম্পর্কে আলোচনা" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আব্দুর রহমান খান, আইডিঃ ২১৬০১০৩২৫ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " আহলে কুরআন সম্পর্কে আলোচনা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।



(স্বাক্ষর)

আব্দুর রহমান খান

আইডিঃ ২১৬০১০৩২৫

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২ জুন, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ভূমিকা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর থেকেই, যুগে যুগে হাদীস অস্বীকারের ফিতনা শুরু হয়েছে। যদিও শুরুতে সমগ্র হাদীস অস্বীকারের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম ছিলো, অনেকটা ব্যাক্তিগত পর্যায়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যেত আংশিক হাদীস অস্বীকারের নমুনা। সাহাবায়ে কিরাম ও পরবর্তীতে তৎকালীন উলামায়ে কিরামের এ ফিতনার বিরুদ্ধে প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ অনেকটাই সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিলো সেই তৎকালীন ফিতনার অবসানে। কিন্তু চতুর্দশ হিজরী থেকে অতীতের সকল ফিতনা একত্রিত হয়ে সমগ্র হাদীস অস্বীকারের এক নতুন ফিতনার যাত্রা শুরু হয়েছে। যারা নিজেদেরকে ‘আহলে কুরআন’ নামে পরিচয় দিয়ে থাকে। এ ফিতনার অবসানের জন্য বর্তমানের উলামায়ে কেরামের প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে। এই থিসিসে ‘আহলে কুরআন’ দাবীদার দল সম্পর্কে আলোচনার প্রয়াস করা হয়েছে।

আহলে কুরআনের পরিচয়

আহলে কুরআন বা প্রকৃত আহলে কুরআন

'আহলে কুরআন' শব্দটি মূলত একটি দ্বীনী পরিভাষা, রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে,

عَنْ أنسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللَّه عليه وسلم: إنَّ للهِ أَهْلِينَ منَ النَّاسِ، فقيل: مَن أهلُ اللهِ منهم؟ قال: أهلُ القُرآنِ هم أهلُ اللهِ وخاصَّتُه.

অর্থঃ আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নিশ্চয়ই মানুষের মধ্যে অনেকে আল্লাহর 'আহল' (অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার বিশেষ ব্যক্তি)। জিজ্ঞেস করা হল, তারা কারা? তিনি বললেন, তারা হল আহালুল কুরআন (বা কুরআন ওয়ালা)। তারাই আল্লাহর আহল ও তাঁর ঘনিষ্ঠজন। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১২২৭৯; সুনানে কুবরা, নাসায়ী, হাদীস ৭৯৭৭; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২১৫)

এই হাদীস অনুযায়ী বিশ্ব নবী মুহাম্মাদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন শ্রেষ্ঠ আহলে কুরআন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা নবী মুহাম্মাদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কুরআন নাযিল করেছেন, তাঁকে কুরআন তিলাওয়াত, কুরআনের ব্যাখ্যা ও তাফসীর শিখিয়েছেন। তাঁকে দায়িত্ব দিয়েছেন তিনি যেন মানুষকে কুরআন তিলাওয়াত শিখান, কুরআনের অর্থ-মর্ম ও বিধি-বিধান শেখান, তাদের সামনে কুরআনী জীবনের বাস্তব নমুনা পেশ করেন, কুরআনের নির্দেশিত ইবাদাতসমূহের পদ্ধতি ও পরিপূর্ণ রূপরেখা শেখান এবং তাদেরকে কুরআনী শরীয়ত শিক্ষা দেন।

এরপর মানুষের উপর ফরয করেছেন- এই সকল বিষয়ে তারা যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করে, তাঁর অনুসরণ করে এবং তাঁর জীবন থেকে নিজেদের জীবনের আদর্শ গ্রহণ করে। সঙ্গে কুরআনে এই সাক্ষ্যও দিয়ে দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে কুরআন এবং তাতে নির্দেশিত সিরাতে মুসতাকীমেরই পথ দেখান। কুরআনী নূরের মাধ্যমেই তিনি মানুষকে ভ্রষ্টতা ও মূর্খতার অন্ধকার থেকে হেদায়েত ও ইলমের আলোর দিকে নিয়ে যান।

অতএব খাতামুন নাবিয়্যীন হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন সর্বপ্রথম ও সবচে বড় 'আহলুল কুরআন' বা কুরআনওয়ালা। তিনি কুরআন তিলাওয়াত, কুরআন শিক্ষাদান, কুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, কুরআনের হেদায়াত ও শিক্ষার বাস্তবায়ন এবং নিজের জীবনে কুরআনের বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপনে ছিলেন সবার থেকে এগিয়ে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের আহলুল কুরআন হলেন সাহাবায়ে কিরাম। সাহাবায়ে কিরামকে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কুরআনের সর্বপ্রথম তালিবে ইলম হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন। তাঁদেরকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন স্বয়ং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যার উপর এই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুরআন সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে মানদণ্ড বানিয়েছেন। যেমন কুরআনের প্রতি ঈমান, কুরআনের পাঠ ও তার তিলাওয়াত, কুরআন অনুধাবন, কুরআনের ব্যাখ্যা, কুরআন অনুযায়ী আমল ইত্যাদি। আর এই মহান আমানতের প্রথম বহনকারী ও প্রথম সাক্ষ্যদানকারী বানিয়েছেন সাহাবায়ে কিরামকে। পরবর্তীদেরকে কুরআন হাসিলের ক্ষেত্রে তাদের মুখাপেক্ষী বানিয়েছেন। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সীরাত ও শিক্ষা ছেড়ে কুরআনের প্রতি ঈমান আনাই অসম্ভব। আর সাহাবায়ে কিরামকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কুরআনী যিন্দেগীর উপর রেখে গিয়েছেন সেটাই 'সাবীলুল মুমিনীন'-মুমিনদের পথ। মুমিনদের পথ থেকে বিমুখ হওয়া আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার নিকট এমন অপরাধ, যেমন

অপরাধ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করা। এই দুই অপরাধের একই শাস্তি আর সেটা হল জাহান্নাম।

তৃতীয় পর্যায়ে আছেন তাবে'ঈন এবং তাবে-তাবেঈনরা। এভাবে প্রতি যুগে যারাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামের আদর্শ অনুসরণ করে নিজেদের জীবনে কুরআনের এই আদর্শ বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন, তারাই প্রকৃত আহলে কুরআন। মুসলিম উম্মাহর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণই এই আদর্শকে আহলে কুরআন বা কুরআন-ওয়ালা আদর্শ মনে করে।

নব্য আহলে কুরআন

যুগ যুগ ধরে চলে আসা প্রকৃত আহলে কুরআনের নাম বিকৃত করে, তাদের আদর্শ থেকে দূরে সরে গিয়ে একশ্রেণীর মানুষ নিজেদেরকে 'আহলে কুরআন' দাবি করছে। এরা প্রকৃত আহলে কুরআন নয়, এরা হল 'নব্য আহলে কুরআন'। এরা মুসলিম নয় এবং এরা প্রাচ্যবিদদের দ্বারা প্রভাবিত, তাদের চেতনায় উজ্জীবিত এক দল। তারা হাদীসকে হুজ্জত বা শরীয়তের দলীল মনে করে না।

এরা বাহ্যিকভাবে যতই চটকদার ভাষা ব্যবহার করুক না কেন, কুরআনের সাথে এদের কোন সম্পর্ক নেই এবং এরা ইসলাম থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে। এদের আদর্শের বিচ্যুতির বড় দিক হল, এরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস ও সুন্নাহকে দ্বীন ও শরীয়তের হুজ্জত বা দলীল মনে করে না। তারা শুধু কুরআন মাজীদকে দ্বীন ও শরীয়তের দলীল বা তথ্যসূত্র মনে করে। তারা শুধু কুরআন মাজীদকেই বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ মনে করে। (মাসিক আল-কাউসার, নভেম্বর সংখ্যা, ২০২০ খৃষ্টাব্দ)

হাদীস অস্বীকারের ফিতনার উৎপত্তি

প্রাচীন যুগেই হাদীস অস্বীকারের ফিতনার সূচনা হয়ে আজ অবধি এ ফিতনা চলছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক বড় মুজিজা যে, তিনি এ দুনিয়া ছেড়ে যাওয়ার পূর্বেই এ ফিতনা সম্পর্কে সতর্ক করে গেছেন। তিনি ইরশাদ করেন,

ألا إنِّي أوتيتُ الكتابَ ومثلَهُ معهُ ، ألا يُوشِكُ رجُلٌ شبعانٌ على أريكتِهِ يقولُ عليكُم بِهذَا القُرآنِ فما وجدتُم فيهِ مِن حَلالٍ فأحلُّوه وما وَجدتُم فيهِ مِن حرامٍ فحرِّمُوه ، ألا لا يحلُّ لكُم لحمُ الحِمارِ الأهليِّ ، ولا كلِّ ذي نابٍ من السَّبُعِ...

অর্থঃ আমাকে কিতাব ও তার মত অনুরূপ জিনিস দান করা হয়েছে। জেনে রাখো, অচিরেই এমন মানুষের আবির্ভাব হবে যে আপন সিংহাসনে পরিতৃপ্ত হয়ে বসে থাকবে। বলতে থাকবে, তোমরা এই কুরআনকে আঁকড়ে ধরো! তোমরা তাতে যে হালাল এর বিবরণ পাও তা গ্রহণ করো আর যা হারাম পাওয়া থেকে বিরত থাকো। (অথচ কুরআনে নেই এমন অনেক কিছু হারাম) জেনে রাখো, তোমাদের জন্য গৃহপালিত গাধার গোস্ত খাওয়া হালাল নয় এবং প্রত্যেক থাবা বিশিষ্ট হিংস্র প্রাণীও হালাল নয়... (সুনানে আবূ দাঊদ, হাদীস ৪৬০৪)

তিনি আরও বলেন,

لا أُلفِيَنَّ أحَدَكم متَّكِئًا على أريكتِهِ يأتيه الأمرُ مِن أمري، ممَّا أمَرْتُ به أو نهَيْتُ عنه، فيقولُ: لا ندري، ما وجَدْنا في كتابِ اللهِ اتَّبَعْناه.

অর্থঃ আমি তোমাদের কাউকে যেন এই অবস্থায় না পাই, যে সিংহাসনে আরামে বসে আছে। তার কাছে আমার কোনও আদেশ বা নিষিদ্ধ বাণী আসলো আর সে বলে বসলো, এসব আমরা জানিনা। আমরা কুরআন মাজীদে যা পাবো শুধু তার অনুসরণ করব! (সুনানে আবূ দাঊদ, হাদীস ৪৬০৫)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছে। বিভিন্ন কালে বিভিন্ন জায়গায় এমন অনেক ব্যক্তি বা দলের প্রকাশ ঘটেছে, যারা হাদীসে নববীর প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করেছে। হাদীস ও সুন্নাহর বিষয়ে মানবমনে সন্দেহের বীজ বপন করার অপচেষ্টা চালিয়েছে। অপরদিকে উলামায়ে কিরামও তাদের সংশয়ের উপযুক্ত জবাব প্রদান করেছেন এবং হাদীসে নববীর প্রামাণিকতার কথা বিস্তারিত দলীল সহ তুলে ধরেছেন।

অতীতে হাদীস অস্বীকারের ফিতনা

হাদীসে নববীকে অস্বীকার কোনো নতুন বিষয় নয়, হিজরী প্রথম শতকেই এর সূচনা হয়েছে। সাহাবায়ে কিরামের যুগেই কোন কোন ব্যক্তি হাদীসে নববীকে দ্বীন ও শরীয়তের তথ্যসূত্র হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) ও হাফেজ ইবনে আব্দুল বার্র (রহ.) সাহাবী হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) এর সঙ্গে এমন এক ব্যক্তির ঘটনা ইমাম আবু দাঊদ (রহ.) উল্লেখ করেছেন,

قال رجُلٌ لعِمرانَ بنِ حُصَينٍ: يا أبا نُجَيْدٍ، إنَّكم لتُحدِّثونا بأحاديثَ ما نجِدُ لها أصلًا في القُرآنِ، فغضِبَ عِمرانُ، وقال للرجُلِ: أوَجدْتُم في كلِّ أرْبَعينَ دِرهمًا دِرهمًا، ومن كلِّ كذا وكذا شاةً شاةً، ومن كلِّ كذا وكذا بعيرًا كذا وكذا، أوَجدْتُم هذا في القُرآنِ؟ قال: لا، قال: فعمَّنْ أخذْتُم هذا؟ أخَذْتُموه عنا، وأخَذْناه عن نبيِّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وذكَرَ أشياءَ نحوَ هذا.

অর্থঃ হযরত ইমরান ইবনে হোসেন (রা.)-কে এক লোক এসে জিজ্ঞাসা করল, হে আবূ নুজাইদ! আপনারা আমাদের কাছে এমন কিছু বিষয়ে বর্ণনা করেন, কুরআন মাজীদে আমরা যার সন্ধান পাই না। তখন তিনি রাগান্বিত হয়ে বললেন, চল্লিশ দিরহামের এক দিরহাম, এত এত বকরিতে এতটি বকরি, এত এত উটে এতটি উট দিতে হবে। কুরআন মাজীদে কি এ বিষয়ের আলোচনা দেখতে পাও? সে লোকটি বলল, না। এরপর জিজ্ঞাসা করল, আপনারা এগুলো কার কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন? তখন তিনি বললেন, তোমরা তা আমাদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছ আর আমরা তা আল্লাহর নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে গ্রহণ করেছি। (সুনানে আবূ দাঊদ, হাদীস ১৫৬১)

মুসতাদরাকে হাকিমের অপর এক বর্ণনায় এসেছে,

عن الحَسَنُ البصري، قالَ: بَيْنَما عِمْرانُ بْنُ حُصَيْنٍ يُحَدِّثُ عن سُنَّةِ نَبِيِّنا صلَّى اللهُ عليه وسلم إذْ قالَ له رَجُلٌ: يا أبا نُجَيْدٍ، حَدِّثْنا بالقُرْآنِ. فقالَ لهُ عِمْرانُ: أنتَ وأَصْحابُكَ تَقْرَؤونَ القُرْآنَ، أَكُنْتَ مُحَدِّثِي عنِ الصَّلاةِ وما فيها وحُدودِها؟ أَكُنْتَ مُحَدِّثِي عنِ الزَّكاةِ في الذَّهَبِ والإبِلِ والبَقَرِ وأَصْنافِ المالِ؟ ولكنْ قدْ شَهِدْتُ وغِبْتَ أنتَ. ثُمَّ قالَ: فَرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم في الزَّكاةِ كذا وكذا. وقالَ الرَّجُلُ: أَحْيَيْتَني أَحْياكَ اللهُ. قالَ الحَسَنُ: فما ماتَ ذلك الرَّجُلُ حتَّى صارَ مِنْ فُقهاءِ المُسْلِمينَ.

অর্থঃ হাসান বসরী (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করছিলেন। তখন এক লোক তাকে বলল, হে আবু নুজাইদ! আপনি আমাদেরকে কুরআন থেকে বর্ণনা করুন। তিনি তাকে বললেন, তুমি ও তোমার সঙ্গীরা তো কুরআন পাঠ করে থাকো। তুমি কি আমাকে নামাযের বিস্তারিত বিবরণ দিতে পারবে? তুমি কি আমাকে স্বর্ণ, উট, গরু ও নানা রকম সম্পদের যাকাত সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিতে পারবে? বাস্তব কথা হল, আমি উপস্থিত ছিলাম আর তুমি অনুপস্থিত ছিলে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে যাকাত সম্পর্কিত নানা পরিমাণের কথা বর্ণনা করেছেন। তখন লোকটি বলে উঠলো, আপনি আমাকে রক্ষা করেছেন। আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করুন। হাসান বসরী (রহ.) বলেন, লোকটি একজন মুসলিম ফকীহ হয়ে মারা যান। (মুসতাদরাকে হাকীম, হাদীস ৩৭৬)

সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) এর সঙ্গেও এরকম একটি ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়,

عن أُمَيَّةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ خالدٍ، أنَّهُ قالَ لعبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ: إنَّا نجِدُ صلاةَ الحضرِ وصلاةَ الخوفِ في القرآنِ، ولا نجدُ صَلاةَ السَّفرِ في القُرآنِ؟ فقالَ عبدُ اللَّهِ: يا ابنَ أخي، إنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ بعثَ إلينا مُحمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلم، ولا نعلَمُ شيئًا، فإنَّما نَفعلُ كما رأينا مُحمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلم يفعَلُ.

অর্থঃ তাবি'ঈ উমাইয়্যা ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে খালীদ থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-কে বললেন, আমরা তো মুকীমের নামায ও ভীতিকালীন নামাযের কথা কুরআন মাজীদে দেখতে পাই, কিন্তু সফরের নামাযের কথা তো কুরআন মাজীদে পাই না। তখন তিনি বললেন, হে ভাতিজা! আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন। আমরা কিছুই জানতাম না। আমরা তাই করতাম, যা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে করতে দেখেছি। (সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস ৯৪৬)

মূলত এ সময় সব বিষয় শুধু কুরআন মাজীদে অনুসন্ধান করার মানসিকতার সৃষ্টি হয়। সাহাবায়ে কিরাম (রা.) এই মানসিকতার বিরোধিতা করেন এবং তা খন্ডন করে হাদীসে নববী ব্যাপারে মানুষের মাঝে সঠিক চিন্তা বিস্তার করার প্রয়াস পান। অনেকে সাহাবায়ে কিরাম (রা.) কর্তৃক সংশয় দূর হবার পর তা মেনে নিয়েছেন। কিন্তু কালক্রমে এই চিন্তা বেড়ে এক সময়ে সেটা গোমরাহীর নিদর্শনে পরিণত হয়। এজন্য বিখ্যাত তাবি'ঈ আইয়ূব সাখতিয়ানী (রহ.) এ বিষয়ে সতর্ক করে বলেন,

إِذاً حَدَّثْتَ الرَّجُلَ بِالسُّنَّةِ فَقَالَ: دَعْنَا مِنْ هَذَا وَحَدِّثْنَا مِنَ الْقُرْآنِ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ ضَالٌّ مُضِلٌّ.

অর্থঃ যখন দেখবে কোনও ব্যাক্তির কাছে হাদীস বর্ণনা করলে বলে – আমাদেরকে এ থেকে মুক্তি দেন এবং কুরআন মাজীদ থেকে তা বর্ণনা করুন, তখন জেনে রাখো, সে লোকটি নিজে পথভ্রষ্ট ও অন্যদেরকে বিপথে পরিচালনাকারী। (আল-কিফায়া ফী ইলমির-রিওয়ায়া, খতীব বাগদাদী, পৃষ্ঠাঃ ১৬)

এ যাবৎকাল পর্যন্ত এ ভয়ংকর চিন্তা কোনও দল বা গ্রুপের রূপ পরিগ্রহ করেনি, বরং তা ব্যক্তি পর্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিল। যখন কিছুকাল অতিক্রান্ত হল এবং ইসলামের শত্রুরা মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে ফাটল ধরানোর চেষ্টায় সফল হল, তখন মুসলিমদের মাঝে এমন কিছু দল-উপদল সৃষ্টি হল যারা হাদীসে নববীর গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য এমন মনগড়া কিছু নীতিমালা প্রস্তুত করলো, যা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের বিশেষজ্ঞ আলেমদের প্রণীত নীতিমালার সঙ্গে মিলে না। এভাবে তারা সরাসরি হাদীসে নববীর প্রামাণিকতাকে অস্বীকার না করলেও প্রকারান্তরে তারা বহু হাদীসের প্রামাণিকতাকে অস্বীকার করে বসে। এদের মাঝে উল্লেখযোগ্য কিছু দল হল শিয়া, খাওয়ারিজ ও মু'তাযিলা। (দিরাসাত ফিল হাদীসিন-নাবাউই ওয়া তারীখি তাদওয়ানিহী, ড. মুহাম্মাদ মুস্তফাল-আ'যমী, পৃষ্ঠাঃ ১/২২-২৫)

শিয়া মতবাদ

আভিধানিক অর্থে শিয়া বলতে দল-উপদলকে বোঝানো হয়। হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের পর হযরত আলী (রা.) ও হযরত মুআবিয়া (রা.)-এর মাঝে হযরত উসমান (রা.)-এর কিসাস নিয়ে মতানৈক্য দেখা দেয়। এ সময় যারা হযরত আলী (রা.) এর পক্ষে রাজনৈতিক সমর্থন যোগায় তাদেরকেও শিয়া বলা হয়। (আশ-শীয়া ওয়াত-তাশাইয়ূ ফিরাকুন ওয়া তারীখ, ইহসান ইলাহী যহীর, পৃষ্ঠাঃ ১৩)

পরবর্তীতে পারিভাষিক অর্থে শিয়া বলতে বোঝায় ওই সমস্ত লোকদেরকে যারা হযরত আলী (রা.)-কে হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.) ও হযরত উসমান (রা.)-এর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করে থাকে। তারা এ আক্বীদা পোষণ করে থাকে যে, নবী পরিবার খুলাফায়ে রাশিদীন থেকেও খিলাফতের বেশি উপযুক্ত। আর এসব খলিফার খিলাফত অবৈধ। তাদের নানা দল-উপদল সৃষ্টি হয় এবং এক দল আরেক দলকে কাফের আখ্যা দিয়ে থাকে। তাদের একটি প্রসিদ্ধ দলের নাম হল ইমামিয়া ফেরকা। তারা ১২ জন ব্যক্তিকে নিজেদের ইমাম আখ্যা দিয়ে থাকে এবং এই বিষয়টাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তাদের মতে ১২ ইমামের মধ্যে সর্বশেষ ইমাম মুহাম্মাদ আল-মাহদী, তিনি 'সুররা মান রআ' পাহাড়ের গুহায় আত্মগোপন করে আছেন। (আল-মাউসূয়াতুল মুয়াস্সারা ফিল আদিয়ান ওয়াল-মাযাহিব ওয়াল-আহযাবিল মা'আসিরাহ, ড. মানি' ইবনে হাম্মাদ আল-জুহানী, পৃষ্ঠাঃ ৫১-৫২)

হাদীসে নববীর বিষয়ে শিয়াদের অবস্থান

হাদীসে নববীর হুজ্জিয়াত তথা প্রামাণিকতার বিষয়ে রয়েছে তাদের নানা বক্তব্য, যা হাদীসের প্রমাণিকতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। নিম্নে কিছু ভ্রান্ত বিশ্বাসের কথা তুলে ধরা হল,

১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর কিছু সংখ্যক সাহাবী ছাড়া প্রায় সকল সাহাবী মুরতাদ ও বিপথগামী হয়েছে বলে তারা বিশ্বাস করে থাকে। তাই তারা আহলে বাইত ছাড়া কোনও সাহাবীর হাদীস কে হুজ্জত বা প্রমাণযোগ্য মনে করে না। (দিরাসাত ফিল হাদীসিন-নাবাউই ওয়া তারীখি তাদওয়ানিহী, ড. মুহাম্মাদ মুস্তফা আল-আ'যমী, পৃষ্ঠাঃ ১/২৫)

২) একমাত্র আহলে বাইতের প্রশংসায় বর্ণিত হাদীসকে তারা হুজ্জত বা প্রমাণযোগ্য বলে বিশ্বাস করে থাকে। (যাওয়াবিগ ফী ওয়াজহিস-সুন্নাহ কাদীমান ওয়া হাদীসান, সালাহুদ্দীন মাক্বুল আহমাদ, পৃষ্ঠাঃ ৬৩)

৩) তারা আহালে বাইত ছাড়া যেসব সাহাবীর হাদীসকে হুজ্জত মনে করে, সেসব হাদীস হুজ্জত হবার জন্যও তাদের শর্ত হল যে, তা তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিবর্গ ও তাদের ইমামদের সূত্রে বর্ণিত হতে হবে। এক্ষেত্রে তাদের মূলনীতি হল, যারা হযরত আলী (রা.)-কে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে না, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসিয়তকে অগ্রাহ্য করল এবং হকের পতাকাবাহী ইমামদের সঙ্গে বিরোধীতায় লিপ্ত হলো। তাই তারা আর আস্থাযোগ্য থাকলো না। (আল-ফিরাকুল কাদীমা ওয়াল-মুআসিরা, ড. মুহাম্মাদ হাসান বাখীত, পৃষ্ঠাঃ ৮৯)

৪) তারা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মত হাদীসের কিতাবকে গ্রহণযোগ্য মনে করে না বরং তারা কিছু জাল কিতাব রচনা করেছে, যার অধিকাংশ হাদীসই মিথ্যা। যেমন 'উসূলুল কাফী'। এটাকে তারা সহীহ বুখারীর মর্যাদা দিয়ে থাকে। তাদের এই কিতাবে অসংখ্য জাল হাদীস রয়েছে এবং অসংখ্য অপরিচিত রাবী রয়েছে। তা সত্ত্বেও তারা তাকে হাদীসের সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ মনে করে।

৫) তারা যেসব হাদীস বর্ণনা করে, তার কোনও অবিচ্ছিন্ন সূত্র নেই। তাদের অধিকাংশ হাদীসই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে না।

৬) তাদের কাছে এমন কোনও নির্ভরযোগ্য কিতাব নেই, যা তাদের হাদীসের রাবীদের জীবনী নিয়ে আলোচনা করবে। তাদের বর্ণিত হাদীসের অধিকাংশ রাবী অপরিচিত। (হুজ্জিয়াতুস-সুন্নাহ ওয়া তারীখুহা, ড. হাসান শাওয়াত, পৃষ্ঠাঃ ২৬৬-২৬৮)

৭) তারা সাহাবায়ে কিরামকে কাফের সাব্যস্ত করেছে। মনগড়া নতুন দ্বীন প্রবর্তন করেছে এবং তারা তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে হাদীস জাল করেছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সকল আলেম ও সকল ঐতিহাসিক এ বিষয়ে একমত যে, হাদীসে নববী জাল করার সূচনা তাদের মাধ্যমেই হয়েছে। (হুজ্জিয়াতুস-সুন্নাহ ওয়া তারীখুহা, ড. হাসান শাওয়াত, পৃষ্ঠাঃ ২৬৬-২৬৮)

এভাবে হাদীসে নববীর ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে – সাহাবায়ে কিরামকে কাফের, মিথ্যাবাদী এবং অবিশ্বস্ত আখ্যা দিয়ে অসংখ্য হাদীসকে জাল করেছে। অথচ সাহাবায়ে কিরামের আদালত ও নির্ভরযোগ্যতার বিষয়ে কুরআনের আয়াত ও হাদীসে স্পষ্ট উক্তি রয়েছে, যা এ কথা প্রমাণ করে যে, সাহাবায়ে কিরাম সত্যের মাপকাঠি এবং দ্বীন ও শরীয়তের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত ও আস্থাভাজন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন,

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا.

অর্থঃ মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এবং যারা তাঁর সঙ্গে আছে তারা কাফেরদের প্রতি অতি কঠোর। পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। তুমি তাদের দেখবে রুকূ' ও সিজদারত। তারা অন্বেষণ করে আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি। তাদের নিদর্শন তাদের চেহারায় পরিস্ফুট, সেজদার প্রভাবে। এই হল তাদের গুণাবলি, যা তাওরাতে বর্ণিত আছে। আর ইঞ্জিলে তাদের দৃষ্টান্ত এই, যেন এক শস্যক্ষেত্র, যা তার কুঁড়ি বের করল, তারপর তাকে শক্ত করল। তারপর তা পুষ্ট হল। তারপর নিজ কাণ্ডের উপর এভাবে সোজা দাঁড়িয়ে গেল যে, কৃষক তা দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। এটা এই জন্য যে, আল্লাহ তাদের দ্বারা কাফেরদের অন্তর্দাহ সৃষ্টি করেন। যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তাদেরকে মাগফিরাত ও মহা পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। (সূরা আল-ফাতহঃ ২৯)

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আরো বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ.

অর্থঃ যারা আল্লাহর রাসূলের সামনে নিজেদের আওয়াজ (কণ্ঠস্বর) নীচু রাখে, তারাই এমন লোক, আল্লাহ যাদের অন্তরগুলোকে যাচাই করেছেন তাকওয়ার জন্য। তাদের জন্যে রয়েছে মাগফিরাত ও মহাপুরস্কার। (সূরা আল-হুজরাতঃ ৩)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لا تَسُبُّوا أَصْحابِي، فلوْ أنَّ أحَدَكُمْ أنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، ما بَلَغَ مُدَّ أحَدِهِمْ ولا نَصِيفَهُ.

অর্থঃ তোমরা আমার সাহাবীদেরকে গালমন্দ কোর না। কারণ যদি তোমাদের কেউ উহুদ পরিমাণ স্বর্ণও দান করে, তাও সে তাদের একজনের এক মুদ বা তার অর্ধেক পরিমাণও পৌঁছতে পারবে না। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৬৭৩)

সুতরাং কুরআন ও হাদীসের এসব বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, সাহাবায়ে কিরাম ছিলেন নির্ভরযোগ্য ও আস্থাভাজন। তাদের কথা দ্বীন ও শরীয়তের জন্য হুজ্জত ও দলীল।

খারেজী মতবাদ

ইসলামী ইতিহাসের সূচনাকালে যেসব বাতিল ফেরকার উদ্ভব ঘটে, খারেজী ফেরকা তাদের অন্যতম। এ ফেরকা বিভিন্ন দলে বিভক্ত। আযারিকা, সাফারিয়া, নাজদাত ও ইবাদিয়া খারেজী ফেরকার কিছু শাখাগত দল। ইবাদিয়া ছাড়া বর্তমানে আর কোনও দলের অস্তিত্ব নেই। এ ফেরকার আত্মপ্রকাশের কথা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন,

عَنِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قالَ: بعَثَ عليٌّ وهو باليَمنِ بذُهَيْبَةٍ بتُرْبَتِها إلى رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلم، فقَسَمَها رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلم بينَ أربعةِ نفَرٍ... فغضِبَتْ قُرَيشٌ، وقال مرَّةً أخرى: صَناديدُ قريشٍ، فقالوا: تُعْطي صَناديدَ نَجْدُ وتَدَعُنا؟ قال: إنَّما فعَلْتُ ذلك لِأَتَألَّفَهم، فجاءَ رجُلٌ كَثُّ اللِّحيةِ، مُشرِفُ الوَجْنَتَيْنِ، غائِرُ العينَيْنِ، ناتِئُ الجَبينِ، مَحلوقُ الرأسِ، فقال: اتَّقِ اللهَ يا مُحمَّدُ... فقال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلم: إنَّ مِن ضِئْضِئِ هذا قومًا يَقرؤونَ القرآنَ، لا يُجاوِزُ حناجِرَهم، يَقتلونَ أهلَ الإسلامِ، ويَدَعونَ أهلَ الأوثانِ، يَمْرُقونَ مِنَ الإسلامِ كما يَمْرُقُ السَّهمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لَئِنْ أدرَكْتُهم لَأَقْتُلَنَّهم قَتْلَ عادٍ.

অর্থঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, হযরত আলী (রা.) ইয়ামান থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে কিছু স্বর্ণ পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা চারজনের মাঝে বন্টন করে দিলেন... তখন কুরাইশের লোকজন রেগে গিয়ে বলল, আমাদেরকে না দিয়ে নাজদের অভিজাত শ্রেণীকে দিচ্ছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তো তাদের মনে প্রভাব সৃষ্টি করার জন্য তাদেরকে দান করি। তখন ঘন দাড়ি বিশিষ্ট, যার দুচোখ কোটরাগত, উঁচু কপাল বিশিষ্ট ও মাথা হলক করা এক ব্যক্তি এসে বলল, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহকে ভয় করুন... রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এর বংশধরের মাঝে এমন এক শ্রেণীর লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা কুরআন পড়বে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। মুসলমানদেরকে হত্যা করবে। মূর্তিপূজকদের ব্যাপারে গাফেল থাকবে। তারা ইসলাম থেকে তেমনি বের হয়ে যাবে, যেমন তীর বর্ষা থেকে বের হয়ে যায়। যদি তাদের দেখা পাই, তবে তাদেরকে আদ জাতির নয় হত্যা করব। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০৬৪)

হাদীসে নববীর বিষয়ে খারেজীদের অবস্থান

১) সাহাবায়ে কিরামের মাঝে মতবিরোধ সৃষ্টি হওয়ার আগ পর্যন্ত তারা হাদীসে নববীকে দ্বীন ও শরীয়তের জন্য দলীল মনে করত। কিন্তু যখন মতবিরোধ দেখা দেয় এবং উভয়পক্ষ থেকে হাকাম বা ফয়সাল নির্ধারণের বিষয়ে আসে, তখন তারা উক্ত মতের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবায়ে কিরামকে কাফের আখ্যা দেয় এবং তাদের বর্ণিত হাদীসকে হুজ্জত বা প্রমাণ মনে করতো না।

২) তারা আহলে বাইত বা নবী পরিবার সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস সমূহকে অস্বীকার করেছে। তাকে হুজ্জত বা দলীল মনে করত না।

৩) তারা শুধু কুরআন মাজীদ ও নিজেদের বিবেক-বুদ্ধিকে দলীল মনে করত।

৪) উপরিউক্ত বক্তব্য থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, খারেজীরা হাদীসে নববীকে অস্বীকার করার পেছনে মূল কারণ হল তাদের মনগড়া নীতিমালা। যেমন সাহাবায়ে কিরামকে কাফের মনে করা, কবিরা গুনাহকারীকে কাফের আখ্যা দেওয়া ইত্যাদি। না হয় অন্যান্য ফেরকা থেকে তাদের বৈশিষ্ট্য হল তারা মিথ্যা বলা জায়েজ মনে করতো না, যেমনটা জায়েয মনে করত শিয়ারা। বরং তারা মিথ্যাবাদীকে কাফের আখ্যা দিয়ে থাকে।

৫) সব খারেজীরা হাদীসে নববীতে অস্বীকার করত না। বরং খারেজীদের একাধিক দল রয়েছে। তার মধ্যে ইবাদিয়া ফেরকা হাদীসে নববীকে হুজ্জত বা দলীল মনে করে। এছাড়া অন্যান্য ফেরকা তাদের মনগড়া নীতিমালার ভিত্তিতে হাদীস ও নববীকে অস্বীকার করতো। (দিরাসাত ফিল হাদীসিন-নাবাউই ওয়া তারীখি তাদওয়ানিহী, ড. মুহাম্মাদ মুস্তফা আল-আ'যমী, পৃষ্ঠাঃ ১/৪১)

মু'তাযিলা ফিরকা

উমাইয়্যা খিলাফতকালের শেষ দিকে ওয়াসিল ইবনে আতা-এর হাত ধরে এ ফেরকার জন্ম হয়েছে। আর আব্বাসী খিলাফতকালে তাদের উত্থান হয়েছে। তাদের ৫টি মৌলিক আক্বীদা সমূহ,

১) **আত-তাওহীদঃ** তারা আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার সিফাত অস্বীকার করত। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার জন্য সবচেয়ে উপযোগী কাজ করা আবশ্যকীয় মনে করতো। কুরআন মাজীদকে মাখলুক মনে করতো। তারা বিশ্বাস করতো কিয়ামতের দিন মুসলিমরা আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলাকে দেখবে না।

২) **আদলঃ** তারা তাকদীরকে অস্বীকার করতো, ভালো-মন্দ নির্ণয়ে আকল-বুদ্ধিকে বিচারক মনে করতো।

৩) **আল-মানযিলা বাইনাম মানযিলাতাইনঃ** যে কবীরা গুনাহ করে, সে দুনিয়াতে কাফেরও নয় আবার মুমিনও নয়। বরং দুনিয়াতে তারা মাঝামাঝি থাকবে। কিন্তু আখিরাতে চিরতরে জাহান্নামী হবে।

৪) **আল ওয়া'দ ওয়াল-ওয়া'ঈদঃ** তারা ধমকি বিষয়ক আয়াত ও হাদীসগুলো সর্বদা বাহ্যিক অর্থে নিয়ে থাকে। তাই যারা কবীরা গুনাহ করে তাদেরকে জাহান্নামী মনে করে।

৫) **আল-আমরু বিল-মা'রূফ ওয়ান-নাহয়ু আনিল-মুনকারঃ** তারা শরীয়তের মূলনীতির প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করেই মুসলিম রাষ্ট্রের কর্ণধারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জায়েয মনে করে। (আল-মাউসূয়াতুল মুয়াস্সারা ফিল আদিয়ান ওয়াল-মাযাহিব ওয়াল-আহযাবিল মা'আসিরাহ, ড. মানি' ইবনে হাম্মাদ আল-জুহানী, পৃষ্ঠাঃ ৬৭-৬৮)

হাদীসে নববীর বিষয়ে মু'তাযিলাদের অবস্থান

১) তারা সাহাবায়ে কিরামের আদালতকে অস্বীকার করেছে এবং তাদের বিষয়ে বেয়াদবি মূলক কথাবার্তা বলেছে। তাদের বর্ণিত অধিকাংশ হাদীসকে তারা অস্বীকার করেছে।

২) তারা হাদীস সহীহ হওয়া না হওয়ার মানদন্ড বানিয়েছে আকল বা বিবেক-বুদ্ধিকে।

৩) তারা যেহেতু ইউনানি ফালসাফা দ্বারা প্রভাবিত ছিল, তাই তারা মনে করত তাদের এসব ফালসাফা ও দর্শন আকল-বুদ্ধির অনুকূল। তাই ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসকে সেসব চিন্তা-দর্শনের অনুগামী করতে হবে। এ কারণে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার সিফাত সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহকে তারা অস্বীকার করত। তবে তারা ঢালাওভাবে হাদীসে নববীকে অস্বীকার করেনি। (দিরাসাত ফিল হাদীসিন-নাবাউই ওয়া তারীখি তাদওয়ানিহী, ড. মুহাম্মাদ মুস্তফা আল-আ'যমী, পৃষ্ঠাঃ ১/২৩-২৫)

আধুনিক যুগে হাদীস অস্বীকারের ফিতনা

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়েছে যে, অতীতের যুগে হাদীস অস্বীকারের যে ফিতনা দেখা দিয়েছিল তা ছিল বিভিন্ন বিষয়ের অধীনে ও নানা ইলমী আলোচনার ছায়াতলে। উলামায়ে ইসলামের শক্ত পদক্ষেপের ফলে তৃতীয় হিজরীর মধ্যেই সেই ফিতনা আর সামনে বাড়তে পারেনি। তাদের সচেতনতার ফলে তা কালের গর্ভে হারিয়ে যায়। কিন্তু চতুর্দশ হিজরীর শুরুর দিকে হাদীস অস্বীকারের সেই ফিতনা আবার নতুন করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। আগে তো ছিল শাখা গত ও বিচ্ছিন্নভাবে, কিন্তু চতুর্দশ হিজরীর শুরুতে তা নতুন করে স্বতন্ত্র ফেরকা ও নতুন মতবাদরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এদের মূল টার্গেট ও লক্ষ্যই হল ইসলামের দ্বিতীয় দলীল হাদীসে নববীকে প্রশ্নবিদ্ধ করা। তার প্রামাণিকতার ক্ষেত্রে সংশয় সৃষ্টি করা। হাদীসের বিষয়টিকে মানুষের দৃষ্টিতে হালকা করে তোলা। আধুনিক যুগে উল্লেখযোগ্য কিছু ফেরকা হাদীসে নববীর হুজ্জিয়াত ও প্রমাণিকতার ক্ষেত্রে সংশয় সৃষ্টি করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

প্রাচ্যবিদদের অপতৎপরতা

পাশ্চাত্য শিক্ষা, পাশ্চাত্য চেতনা ও পাশ্চাত্য সভ্যতা সংস্কৃতিকে প্রাচ্যের কাছে নিয়ে আসার যে আন্দোলন ও পদ্ধতি, তাকেই প্রাচ্যবাদ বা Oriantalism বলে। আর এই আন্দোলনে ব্রতী লোকদেরকে আরবি ভাষায় 'মুসতাশরিক' ও ইংরেজীতে 'Oriantalist' বলা হয়। এরা প্রাচ্যদেশীয় ভাষা, সাহিত্য, সমাজ, সংস্কৃতি, জনগণ, ইতিহাস ও দেশ বিশেষত ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ব্যাপক গবেষণা করে থাকে। এরা ইহুদি-খ্রিষ্টানদের একটি বড় দল। এরা মুসলমানদের বিরোধী শক্তি। অবশ্য একথা প্রমাণিত সত্য যে, প্রাচ্যবাদ হচ্ছে সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক শক্তি ও তৎপরতার ফসল। ক্রুসেড পরবর্তী সময় ইহুদি-খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের মোকাবেলার জন্য ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে ব্যাপক গবেষণায় লিপ্ত হয়েছে। তাদের এসব অপতৎপরতার ফসল হিসেবে অনেক পরাজিত মানসিকতার মুসলিম বুদ্ধিজীবী শ্রেণীও তাদের দলে শামিল হয়েছে। (আল-ইসতিশরাক ওয়াল-মুসতাশরিকুন, ড. আদনান মুহাম্মাদ ওয়াযান, পৃষ্ঠাঃ ১৫-২৯)

হাদীসে নববীর বিষয়ে প্রাচ্যবিদদের অবস্থান

পশ্চিমাদের এ দলটি মুসলিম নয়। এ দলটি প্রাচ্যের মুসলিমদের নানা বিষয় নিয়ে গবেষণা করে যাচ্ছে। তাদের উদ্দেশ্য ইসলাম ও মুসলমানদের খিদমত বা সেবা করা নয়, বরং তাদের অধিকাংশের কর্মতৎপরতা থেকে এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, তারা তাদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যই এসব গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। এ দলটি প্রথমে

চেয়েছিল কুরআন বিষয়ে মুসলিমদের মাঝে সন্দেহের বীজ বপন করতে। কিন্তু যখন তারা বুঝতে পেরেছে যে, কুরআন কেন্দ্রিক মুসলিমদের মাঝে কুরআনের ব্যাপারে সন্দেহের বীজ বপন করা সম্ভব নয়, তখন তারা ইসলামী জীবনাদর্শের দ্বিতীয় দলীল হাদীসে নববীর ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টির পাঁয়তারা করেছে। কারণ কুরআনের চেয়েও হাদীসে নববীর সঙ্গে ফিকহী আহকামের সম্পর্ক বেশি। তাই হাদীসে নববীর ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টি করতে পারলে ইসলামের অধিকাংশ বিধি-বিধানই খতম হয়ে যাবে। (আল-ইসতিশরাক ওয়াল-মুসতাশরিকুন, ড. আদনান মুহাম্মাদ ওয়াযান)

পশ্চিমা এ দলটি হাদীসে নববী, সাহাবায়ে কিরাম ইত্যাদি নানা বিষয় যেসব সংশয় সৃষ্টি করার অপচেষ্টা চালিয়েছে,

১) হাদীসের বড় একটি অংশ দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির ফলাফল। ইমাম মালেক (রহ.) কিতাব লেখার পরই মূলত ইসলামী শরীয়তের উন্নতি ও বিকাশ ঘটেছে এবং তার বিন্যস্ত রূপ লাভ করেছে। কারণ ইমাম মালিক (রহ.) বিবেক-বুদ্ধিকে সেসব হাদীস গ্রহণ ও বর্জনের মানদন্ড আখ্যা দিয়েছেন, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে, সাহাবায়ে কিরামের যুগে ও তাদের পরে তাবি'ঈনের যুগে ছড়িয়ে পড়েছিল। (ইনকারুস সুন্নাহ, ড. আব্দুল মাজীদ গাওরী)

২) শুধু পরবর্তীরাই হাদীস জাল করেনি বরং সাহাবায়ে কিরামও তাতে অংশগ্রহণ করেছেন।

৩) মুহাদ্দিসগণ শুধু হাদীসের সনদ নিয়েই পর্যালোচনা করে থাকেন। হাদীসের ভাষ্য ও মূল বক্তব্য নিয়ে তারা কোনও কথা বলেন না। তাই বহু হাদীস এমন রয়েছে যারা সনদ ঠিক হলেও মূল ভাষা সঠিক নয়।

৪) উমাইয়্যা খলিফাগণ ইমাম ইবনে শিহাব যুহরী (রহ.)-কে দিয়ে হাদীস জাল করিয়েছে। এ কথা স্বয়ং ইবনে শিহাব যুহরীও স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, এসব রাজা-বাদশাগণ আমাদেরকে হাদীস রচনায় বাধ্য করেছে। (মাওক্বীফুল মাদরাসাতিল আল-আক্বালিয়্যাহ মিনাস-সুন্নাতিন নাবাউইয়্যাহ, আমীন সাদিক)

আধুনিক ইসলামপন্থীদের অপতৎপরতা

এ দলের চিন্তা হল জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামকে পশ্চিমা সভ্যতার কাছাকাছি করে তুলে ধরা। ভারত উপমহাদেশে এ দলের নেতৃত্বে কাজ করেছে স্যার সৈয়দ আহমাদ (মৃত্যু ১৩১৫ হিজরী) ও তার অনুসারীগণ। ইসলামী বিশ্বে স্যার সৈয়দ আহমাদকে এই চিন্তার অগ্রনায়ক ও পরিপূর্ণ আইডল মনে করা হয়, কারণ তিনিই এ উপমহাদেশে শিক্ষা সংস্কার আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন এবং এ দেশে সর্বপ্রথম আধুনিক ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করেন যা আলীগড় ইসলামী ইউনিভার্সিটি নামে পরিচিত। স্যার সৈয়দ আহমাদ খান একাধিক বিষয়ে সালাফ ও পূর্বসূরীদের থেকে বিচ্ছিন্ন মত প্রদান করেন। যেমন,

১) বিবেক-বুদ্ধির আলোকে কুরআন মাজীদের তাফসীর করতে হবে। তাই যুগে যুগে উলামায়ে কিরাম যে তাফসীর করেছেন তার সঙ্গে মিল থাকা জরুরী নয়। তিনি আকল ও বিবেককেই তাফসীরের মূল ভিত্তি সাব্যস্ত করেছেন, যেসব আয়াত তার বিবেকের সঙ্গে মিলে না, তার এমন ব্যাখ্যা তিনি করেছেন যা আরবি ভাষা ও তার মূলনীতির সঙ্গে যায় না।

২) তার বিবেকের সঙ্গে যায় না এমন সব সহীহ হাদীসকে তিনি অস্বীকার করেছেন।

৩) তিনি মু'জিযাকে অস্বীকার করেছেন।

৪) জান্নাত-জাহান্নামকে অস্বীকার করেছেন।

৫) ফেরেশতা ও জ্বীনকে অস্বীকার করেছেন।

৬) বিজ্ঞ আলেম, ফক্বীহ ও মুহাদ্দিসদের গালমন্দ করেছেন ও তাদেরকে নিয়ে বিদ্রুপ করেছেন।

৭) ইসলামের বিভিন্ন শিআর নিয়ে ঠাট্টা করেছেন।

৮) তার বক্তব্য হল, আল্লাহর পক্ষ থেকে শুধু কুরআনের মর্ম নাজিল হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে মর্মকে নিজ শব্দে প্রকাশ করেছেন।

এরকম বিভ্রান্তিকর বহু আক্বীদা-বিশ্বাস তিনি লালন করতেন। তার ভ্রান্ত আক্বীদার প্রচারের ফলে পরবর্তীতে এই উপমহাদেশ 'আহলে কুরআন' তথা হাদীস অস্বীকারের ফিতনার সূচনা হয়। (ইনকারুস সুন্নাহ, ড. আব্দুল মাজীদ গাওরী)

আধুনিক ইসলামপন্থীদের হাদীসে নববীর ব্যাপারে অবস্থান

স্যার সৈয়দ আহমাদ খান ও তার অনুসারীদের হাদীস ও নববীর ব্যাপারেও মারাত্মক ঈমান বিধ্বংসী আক্বীদা বিশ্বাস রয়েছে। নিম্নে তাদের কিছু আক্বীদা তুলে ধরা হল,

১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর হাদীসে নববী নির্ভরযোগ্য কিতাবে লিপিবদ্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত মৌখিকভাবে চর্চিত হতে থাকে। হাদীসগুলো লিপিবদ্ধ হওয়ার সময় স্মৃতির উপর নির্ভর করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের থেকে হাদীস লিপিবদ্ধ হওয়ার সময় দূরে হওয়ার কারণে নানা রকম অতিরিক্ত কথা হাদীসে যুক্ত হয়ে গেছে। (ইনকারুস সুন্নাহ, ড. আব্দুল মাজীদ গাওরী; মাক্বালাতুস সায়্যিদ আহমাদ খান, পৃষ্ঠাঃ ১/২৩)

২) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে হাদীসে নববী সংকলিত হয়নি, বরং তা দ্বিতীয় শতকে নানা রাজনৈতিক সংকটের সমন্বয় লিপিবদ্ধ হয়েছে। এর ফলে বহু জাল হাদীস তাতে মিশে গেছে। (মাক্বালাতুস সায়্যিদ আহমাদ খান, পৃষ্ঠাঃ ১/৪৯)

৩) হাদীসের কিতাবে আমরা যেসব বর্ণনা দেখি, এগুলো রাবীদের নিজস্ব শব্দমালা। তারা তাদের বুঝ অনুযায়ী বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ নিঃসৃত শব্দ এখানে নেই। এসব রাবীগণ নিজস্ব শব্দে হাদীস বর্ণনা করার কারণে হাদীসের সঠিক মর্ম হারিয়ে গেছে। তাই সাধারণভাবে হাদীস থেকে উদঘাটিত বিধি-বিধান অনুসরণ করা জরুরি নয়, বরং যেসব বিধি-বিধান উদঘাটিত হয়েছে, তা উলামায়ে কিরামের ইজতিহাদকৃত। তাই তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য বহির্ভূতও হতে পারে। (মাক্বালাতুস সায়্যিদ আহমাদ খান, পৃষ্ঠাঃ ১/৬৯)

৪) মুহাদ্দিসগণ হাদীসের সনদ বা সূত্রের পর্যালোচনার উপর জোর দিয়েছেন, কিন্তু হাদীসের মতন বা মূল ভাষ্য নিয়ে পর্যালোচনার প্রতি গুরুত্ব দেননি।

৫) বর্তমানে মুসলিমদের দায়িত্ব হল হাদীসের ক্ষেত্রে আধুনিক পর্যালোচনার নীতি প্রয়োগ করা। যেমন,

ক. যে হাদীস কুরআনের স্পষ্ট শব্দ ও মর্মের সঙ্গে যাবে তাই শুধু গ্রহণযোগ্য হবে।

খ. হাদীসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃঢ় ও নিশ্চিত বক্তব্য হতে হবে।

গ. এর পক্ষে প্রমাণ থাকতে হবে যে, হাদীসটি যে শব্দে বর্ণিত হয়েছে তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শব্দ।

ঘ. রাবীগণ যে শব্দে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তার মর্ম হাদীস ব্যাখ্যাতাগণের ব্যাখ্যার বাহিরে হবে না।

ঙ. হাদীসটি আকল-বুদ্ধি ও বাস্তবতার সঙ্গে যেতে হবে।

চ. প্রমাণিত ঐতিহাসিক বাস্তবতার সঙ্গে যেতে হবে। (মাক্বালাতুস সায়্যিদ আহমাদ খান, পৃষ্ঠাঃ ১/২৩, ১/৪০)

স্যার সৈয়দ আহমাদ খান হাদীসের গ্রহণযোগ্যতার জন্য যেসব শর্ত জুড়ে দিয়েছেন তা কেবল শাব্দিক মুতাওয়াতির হাদীসের মধ্যেই পাওয়া যায়, এছাড়া অন্যান্য হাদীসের মধ্যে পাওয়া যায় না। অথচ দ্বীনের বহু বিধানের ভিত্তি ঐসব হাদীসের উপর গড়ে উঠেছে।

হাদীস ও সুন্নাহর ক্ষেত্রে স্যার সৈয়দ আহমাদ খানের এধরণের বিভ্রান্তিমূলক নানা বক্তব্য থাকলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি হাদীস নিয়ে এসব বক্তব্য প্রদান করার কোন অধিকার রাখেন না। কারণ হাদীস শাস্ত্রে তার তেমন কোন পারঙ্গমতা ও দক্ষতা ছিল না। শায়খ আব্দুল হাই আল-হাসানী (রহ.) বলেন,

وهو ما أتقن فناً، وتصانيفه شاهدة بما قلته، فإن رأيت مصنفاته علمت أنه كان كبير العقل، قليل العلم، ومع ذلك كان سامحه الله تعالى قليل العمل، لا يصلي ولا يصوم غالبا.

অর্থঃ কোন শাস্ত্রেই তার বিশেষ কোনোও যোগ্যতা ছিল না। তার রচনাবলী দেখলে তাকে খুব বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান মনে হবে, কিন্তু ইলমের দিক থেকে ছিলেন পেছনে। তাছাড়া তার আমলও ভালো ছিল না। (নুযহাতুল খাওয়াতির, আব্দুল হাই হাসানী, পৃষ্ঠাঃ ৮/১১৭৫)

উপরের আলোচনা থেকে বুঝা যায়, যদিও হাদীস অস্বীকারের ফিতনা অতীতে সাহাবায়ে কিরামের যুগ থেকেই উদ্ভূত হয়েছিলো, কিন্তু বর্তমানে তা নতুনরূপ ধারণ করেছে, যাদেরকে মানুষ 'আহলে কুরআন' নামে চিনে, যদিও প্রকৃত পক্ষে তারা হল 'নব্য আহলে কুরআন'।

নব্য আহলে কুরআন

নব্য আহলে কুরআনদের উৎপত্তি

এই ফিরকা স্পষ্টতো হাদীসে নববীর হুজ্জিয়াত তথা প্রামাণিকতাকে অস্বীকার করেছে। উপমহাদেশে এই ফেরকার আবির্ভাব কিছু অযোগ্য ও মূর্খ লোকদের মধ্য দিয়ে হয়েছে, যারা স্যার সৈয়দ আহমাদ খানের চিন্তা-চেতনা দ্বারা প্রভাবিত ছিল এবং এদের মূলে ছিল তারই শিষ্য চেরাগ আলী খান। হাদীস অস্বীকারের ক্ষেত্রে এই দুজনে বিভ্রান্তিমূলক চিন্তার বেশি প্রভাব ছিল। এসব মারাত্মক চিন্তাই আহলে কুরআনের জন্য হাদীস অস্বীকারের পথ সুগম করেছে আর এদের শিকার হয়ে কিছু সাধারণ শিক্ষিত মানুষ তাতে যোগদান করেছে। (আল কুরআনিয়্যিন ওয়া-শুবুহাতুহুম হাওলাস-সুন্নাহ, খাদিম হুসাইন ইলাহী বখশ, পৃষ্ঠাঃ ৯৯-১১১)

তারা একসময় একথা বিশ্বাস করতে লাগল যে, কুরআন মাজীদই সব প্রয়োজন পূরণে সক্ষম, হাদীসের প্রয়োজন নেই। তারা মুহাদ্দিস ও ফকীহদের রেখে যাওয়া মিরাস অস্বীকার করতে লাগলো, নিজেদের মনমতো কুরআনের ব্যাখ্যা করতে লাগলো এবং একেই কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা বলে প্রচার করতে লাগলো। এভাবেই হিজরী চতুর্দশ শতক যেতে না যেতেই তারা নিজেদেরকে 'আহলুল কুরআন ওয়ায-যিকর' আখ্যায়িত করতে লাগলো। (তাদবীনে হাদীস, মানাযির আহসান গীলানী, বইয়ের ভূমিকায় মাওলানা সালমান নদভী, পৃষ্ঠাঃ ২৩)

এ ফিতনাকে শক্তিশালী করা ও তাকে বেগবান করার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বেশ ভূমিকা ছিল। ইসলামের বিকৃতি সাধন ও নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার কাজে তারা বেশ কয়েকজন লোক পেয়ে যায়, যারা তাদের লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যায়। (ইহতিমামুল মুহাদ্দিসীন বিনাক্বদিল হাদীস সানাদান ওয়া মাতনান, ড. মুহাম্মাদ লুকমান, পৃষ্ঠাঃ ৪৫৭)

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ দীনের বিকৃতি সাধন ও দ্বীনকে উপমহাদেশে বিকৃতরূপে তুলে ধরার যে হীন পাঁয়তারা করছিল, তা বাস্তবায়নের জন্য কিছু অসাধু মানুষ তারা পেয়ে যায়, যাদের কয়েকজনের নাম ও তাদের কর্মকাণ্ড নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

১) **আবদুল্লাহ চকরালভীঃ** তার ধারণা ছিল যে, মানুষ তাদের জীবনে যাবতীয় বিষয়ের জন্য শুধু কুরআন মাজীদের মুখাপেক্ষি। এক্ষেত্রে তাদের হাদীসের প্রয়োজন নেই। তারা এ ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তিতে তিনি একটি কিতাব রচনা করেন যার নাম 'আসসালাতুল কুরআনিয়্যাহ' অর্থাৎ কুরআনের নামায। তিনি তাতে নামাযের রুকনসমূহ ও অন্যান্য আমলসমূহ কুরআনের আলোকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন, যদিও তার চেষ্টা ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। তার মৃত্যুর সঙ্গে তার এই চিন্তারও মৃত্যু ঘটে। (মুনকিরুস-সুন্নাহ ফিল হিন্দ, ড. আযহারী, পৃষ্ঠাঃ ২/২১২)

২) **মুহিব্বুল হক আযীমাবাদীঃ** তিনি আব্দুল্লাহ চকরালভীর সঙ্গে 'আহলে কুরআন' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

৩) **আহমাদুদ্দীন অমৃতসরীঃ** তিনি 'আল-উম্মাতুল মুসলিমা' নামে একটি দল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। একই সাথে মাসিক 'আল-বায়ান' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন, যেখানে আব্দুল্লাহ চকরালভীর মতবাদ প্রচার ও হাদীস অস্বীকারের ফিতনাকে চাঙ্গা করার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু আহলে হাদীস আলেম মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরী তার তথাকথিত চিন্তাধারার জোরালো খণ্ডন করেন। (মুনকিরুস-সুন্নাহ ফিল হিন্দ, ড. আযহারী, পৃষ্ঠাঃ ২/২১৩)

৪) **হাফেজ আসলাম জয়রাজপুরীঃ** তিনি হাদীসের প্রমাণিকতার বিষয়ে প্রথমে আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল-জামাআত আক্বীদার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু শেষ জীবনে হাদীসের ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করতে থাকেন এবং অবশেষে এক পর্যায়ে হাদীসের প্রামাণিকতা অস্বীকার করে বসেন। 'তুলূউল ইসলাম' পত্রিকায় তিনি একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। (মুনকিরুস-সুন্নাহ ফিল হিন্দ, ড. আযহারী, পৃষ্ঠাঃ ২/২১৩)

৫) **গোলাম আহমাদ পারভেজঃ** তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের অধীনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কাজ করতেন। ইসলামী আক্বীদা-বিশ্বাস বিষয়ে তার একাধিক রচনা মুসলমানদের হৃদয়ে সন্দেহের বীজ বপন করছিল। 'তুলূউল ইসলাম' নামে উর্দূ ভাষার মাসিক পত্রিকা তারই প্রকাশ করা। আরবী ভাষা ও ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের মনে নানারকম সন্দেহের বীজ বপন করছিল। যেমন, আদম আলাইহিস সালামের ঘটনাকে কাল্পনিক বলে আখ্যা দেয়া, জান্নাতে-জাহান্নামের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা, ফেরেশতাদের অস্বীকার করা ইত্যাদি। এমনকি সে এসব বিষয়ে মনগড়া ব্যাখ্যা প্রদান করত। (মুনকিরুস-সুন্নাহ ফিল হিন্দ, ড. আযহারী, পৃষ্ঠাঃ ২/২১৩-২১৪)

উপমহাদেশে এরাই হাদীস অস্বীকারের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছিল। তাদের হাত ধরেই এই ফিতনা দিন দিন সামনে অগ্রসর হতে থাকে এবং উপমহাদেশে নানা অঞ্চলে তা ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমান এ ফিতনার প্রাদূর্ভাব বহুমাত্রায় বেড়ে গিয়েছে। তারা বিভিন্নভাবে তাদের ভ্রান্তমতাদর্শের প্রচার করে যাচ্ছে। বিষেশ করে, অনলাইন অফলাইনে তাদেরকে সবসময় সরব দেখা যাচ্ছে।

হাদীস অস্বীকার করার অন্তরালে প্রকৃত উদ্দেশ্য

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। মানুষের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন – সবকিছুকেই ইসলাম নিয়ন্ত্রণ করে। ঈমান-আকীদা, ইবাদত-বন্দেগী, মু'আমালাত-লেনদেন, মু'আশারাত-শিষ্টাচার ও আদব-আখলাক সব বিষয়ে ইসলাম চায় মানুষকে সুন্দর রূপে গড়ে তুলতে। আর এই সুন্দর জীবনের জন্য মানুষকে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা দিয়েছেন মহাগ্রন্থ আল কুরআন ও তার বাস্তব নমুনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাস্তব জীবন, যা হাদীস ও সুন্নাহের মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়েছে।

ইসলাম যখন মানুষের সামগ্রিক জীবন নিয়ে কথা বলে, তখন ইসলামের নীতি ও আদর্শের বাহিরে গিয়ে ভিন্ন কোন নীতি ও আদর্শ গ্রহণ করা বা অনুসরণ করার সুযোগ নেই। কিন্তু তিক্ত বাস্তবতা এই যে, সব যুগের ইসলামবিদ্বেষী শক্তি বা পশ্চিমা সভ্যতায় গড়ে ওঠে মানুষগুলো চায় সব দিকে তাদের নীতি ও আদর্শকে ছড়িয়ে দিতে। আর এক্ষেত্রে হাদীস ও সুন্নাহকে তারা বড় বাধা মনে করেছে। তাই ইসলাম বিদ্বেষী নানা অপশক্তি ও প্রাচ্যবিদরা হাদীস ও সুন্নাহকে হয় অস্বীকার করেছে, না হয় তার ব্যাপারে দ্বিধা ও সংশয় সৃষ্টি করেছে। কিন্তু যুগে যুগে বিজ্ঞ উলামায়ে কিরাম সেসব দ্বিধা-সংশয়ের শক্ত জবাব দিয়েছেন এবং তারা সর্বতোভাবে সেসব ফিতনার মূলোৎপাটন করেছেন। এই বিষয়ে শত শত কিতাব যার উজ্জ্বল সাক্ষী হয়ে আছে।

নব্য আহলে কুরআনদের কর্মপন্থা ও নীতিমালা

যেকোনো ফেরকা বা দলের নিজস্ব কিছু নীতিমালা থাকে যাকে কেন্দ্র করে তাদের সমস্ত বক্তব্য ও কর্ম পরিচালিত হয়ে থাকে। যারা হাদীসে নববীর হুজ্জিয়াত বা প্রামাণিকতা অস্বীকার করে, তাদেরও রয়েছে কিছু নিজস্ব নীতিমালা, যার উপর ভিত্তি করে তারা তাদের সমস্ত বক্তব্য ও কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। নিচে তাদের সেসব নীতিমালা সংক্ষেপে তুলে ধরা হল।

১) কুরআন মাজীদ আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার কিতাব। তিনি তাতে সব বিষয়ের বর্ণনা প্রদান করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন,

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ.

অর্থঃ আর আমি আপনার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছি, যেন এটা প্রতিটি বিষয় সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দেয় এবং মুসলিমদের জন্য হয় হেদায়েত, রহমত ও সুসংবাদ। (সূরা আন-নাহলঃ ৮৯)

তিনি আরো বলেন,

مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ.

অর্থঃ আমি কিতাবে কিছুমাত্র ত্রুটি রাখিনি। অতঃপর তাদের সকলকে একত্র করে তাদের প্রতিপালকের নিকট নিয়ে যাওয়া হবে। (সূরা আল-আন'আমঃ ৩৮)

এসব আয়াত দ্বারা তারা সুন্নাহকেন্দ্রিক সংশয়কে এই বলে শক্তিশালী করার চেষ্টা করেছে যে, যখন কুরআন মজীদে সব কিছুর বর্ণনা রয়েছে, তখন আমাদের অন্য কিছুর কী প্রয়োজন থাকতে পারে? এরপরও যদি আমরা অন্য কিছুর প্রয়োজনীয়তার কথা বলি, তাহলে কুরআন মাজীদকে অপূর্ণ আখ্যা দেওয়া হবে।

২) আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা শুধু কুরআন মাজীদকে হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি এরশাদ করেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.

অর্থঃ নিশ্চয়ই আমি কুরআন নাযিল করেছি আর আমিই এর রক্ষাকর্তা। (সূরা আল-হিজরেরঃ ৯)

হাদীস যদি দ্বীন ও শরীয়তে দলীল হতো, তবে তাকেও তিনি হেফাজতের দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। কিন্তু বাস্তবে তিনি দায়িত্ব নেননি। তাই হাদীস শরীয়তের প্রমাণ বা দলীল হতে পারে না।

৩) কিছু হাদীস এমন পাওয়া যায় যা এ কথার উপর প্রমাণ বহন করে যে, শুধু কুরআন মাজীদই শরীয়তের প্রমাণ ও দলীল। যেমন হাদীসে এসেছে,

إِنَّ الْحَدِيثَ سَيَفْشُو عَنِّي فَمَا أَتَاكُمْ عَنِّي يُوَافِقُ الْقُرْآنَ فَهُوَ عَنِّي وَمَا أَتَاكُمْ عَنِّي يُخَالِفُ الْقُرْآنَ فَلَيْسَ عَنِّي.

অর্থঃ নিশ্চই আমার থেকে হাদীস ব্যাপকতা লাভ করবে। যা কুরআন অনুযায়ী হবে তাই কেবল আমার পক্ষ থেকে বলে গণ্য হবে, আর এর যেসব কথা কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক হবে তা আমার পক্ষ থেকে নয়। (মা'রিফাতুস-সুনানি ওয়াল-আছার, ইমাম বায়হাক্বী, ১/৮৪)

নব্য আহলে কুরআনদের দাবি অনুযায়ী এই হাদীসই হাদীসের প্রামাণিকতাকে খন্ডন করেছে।

৪) হাদীসে নববী লেখার সূচনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে হয়নি এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগেও নয়।

৫) সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক হাদীস লেখার নিষেধাজ্ঞার তাৎপর্য বুঝতে পেরেছিলেন, তাই তারাও তা লিখতে নিষেধ করেছিলেন।

৬) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের একশো বছর পর প্রথমবারের মতো হাদীস সংকলিত হয়। এরপর সেসব সংকলন হারিয়ে যায়। অতঃপর তৃতীয় শতকে মানুষের মুখ থেকে শুনে তা সংকলিত হয়।

৭) মওযূ' ও জাল হাদীস এমন ভাবে সহীহ হাদীসের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে যায় যা আলাদা করা অসম্ভব।

৮) মুহাদ্দিসগণ হাদীস যাচাইয়ের যেসব মানদন্ড নির্ধারণ করেছেন, তা হাদীসকে জাল হাদীস থেকে পৃথক করার জন্য যথেষ্ট নয়। কারণ তাদের সেসব মানদণ্ড ছিল কেবলই সনদ কেন্দ্রিক। হাদীসের মতন বা মূল ভাষ্যের ব্যাপারে তাদের কোনও মনোযোগ ছিল না। (ইহতিমামুল মুহাদ্দিসীন বিনাক্বদিল হাদীস সানাদান ওয়া মাতনান, ড. মুহাম্মাদ লুকমান, পৃষ্ঠাঃ ৪৫৮-৪৫৯)

এসব সংশয় তারা প্রাচীন যুগের মু'তাজিলা সম্প্রদায় ও পরবর্তীতে প্রাচ্যবিদদের থেকে ধার করে আধুনিক কালের উপযোগী ভাষায় প্রচার করে থাকে। (ইনকারুস সুন্নাহ, ড. আব্দুল মাজীদ গাওরী, পৃষ্ঠাঃ ৭৮-৮০)

কুরআন মাজীদের আয়াতের পর্যালোচনা

ওহীর প্রকারভেদ

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা নবী মুহাম্মাদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ওহী নাযিল করেছেন দুই প্রকারের এবং এর প্রমাণ আমরা কুরআনুল কারীম থেকে পাই। ওহী দুই প্রকারঃ

১) **ওহী মাতলু বা তেলাওয়াতকৃত ওহীঃ** যে ওহী কুরআনুল কারীমের আকারে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা নবী মুহাম্মাদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল করেছেন। এই প্রকার ওহী কুরআনুল কারীমে অক্ষরে অক্ষরে লিখিত হয়েছে এবং নামাযের ভিতরে এবং নামাযের বাহিরে তা তিলাওয়াত করা হয়।

২) **ওহী গায়রে মাতলু বা তেলাওয়াতকৃত নয় এমন ওহীঃ** যে ওহী কুরআনুল কারীমের অংশ নয় এবং দৈনন্দিন জীবনে তা তিলাওয়াত করা হয় না। এ প্রকার ওহী আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা নবী মুহাম্মাদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল করেছেন বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে যেন কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন বিধি-বিধানের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ দেওয়ার জন্য। ওহী গায়রে মাতলু সবসময় আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার পক্ষ থেকে হুবুহু শব্দে শব্দে প্রকাশ করা হয় নাই (যেগুলো হুবুহু প্রকাশ পেয়েছে, সেগুলোকে হাদীসে কুদসী বলে)। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, এই প্রকার ওহী মুহাম্মাদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপদেশমালা ও কাজকর্মের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে।

ওহী গায়রে মাতলুর প্রমাণ কুরআনুল কারীম থেকে

ওহী গায়রে মাতলু কুরআনুল কারীমের অন্তর্ভুক্ত না হলেও, কুরআনুল কারীমে এ সংক্রান্ত বহু আয়াত রয়েছে এবং এসব আয়াতের নির্দেশনাকে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা নিজের নির্দেশ হিসেবেই উল্লেখ করেছেন। নিম্নে কুরআনুল কারীম থেকে ওহী গায়রে মাতলু সংক্রান্ত কিছু আয়াত তুলে ধরা হলোঃ

১) **মুসলিমদের কেবলা পরিবর্তনের ঘটনাঃ**

মদীনাতে হিজরতের পরে মুসলমানরা প্রাথমিক যুগে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে কেবলা নির্ধারণ করে নামায আদায় করতেন। কিন্তু সতেরো মাস পরে এই বিধান রহিত করে দেয়া হয় এবং বাইতুল্লাহকে নতুন কেবলা নির্ধারণ করে দেয়া হয়। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কুরআনুল কারীমে বলেন,

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ... فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ...

অর্থঃ আপনি যে কেবলার উপর ছিলেন, তাকে আমি এজন্যই কেবলা করেছিলাম, যাতে একথা প্রতীয়মান হয় যে, কে রাসূলের অনুসারী থাকে আর কে পিঠটান দেয়... এখন আপনি মসজিদুল-হারামের দিকে মুখ করুন... (সূরা আল-বাকারাঃ ১৪৩-১৪৪)

এখানে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা '**আপনি যে কেবলার উপর ছিলেন, তাকে আমি এজন্যই কেবলা করেছিলাম**' –এ কথার দ্বারা মাসজিদুল হারামের কথা তথা বাইতুল্লাহ-এর কথা বলেছেন, কিন্তু সমগ্র কুরআনে বাইতুল্লাহকে কেবলা করার কথা খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু এরপরের অংশ '**যাতে একথা প্রতীয়মান হয় যে, কে রাসূলের অনুসারী থাকে আর কে পিঠটান দেয়**' দ্বারা বুঝা যায় বায়তুল্লাহকে কেবলা করার কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। তাহলে প্রশ্ন আসে যে, তিনি কার অনুমতিতে এই কাজ করেছেন? নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই নির্দেশনা দিয়েছেন বলেই নবী এই কাজ করেছেন। তাহলে এখান থেকে বুঝা যাচ্ছে, আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কুরআন মাজীদ

ব্যাতীতও তাঁ নির্দেশনা নাযিল করেছিলেন যার বাস্তবায়নও করেছিলেন নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। শুধু তাই নয়, এই নাযিলকৃত বিধানকে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা নিজের আদেশও বলেছেন কুরআনুল কারীমে।

২) **রোযার সময় ও রমাদানে স্ত্রীদের কাছে গমনের নিয়মের পরিবর্তনঃ**

ইসলামের প্রাথমিক কালে মুসলমানদের প্রতি নির্দেশ ছিল যে, যদি কোন মুসলমান রোজার সময় ইফতার করে অল্প কিছুক্ষণের জন্যও ঘুমিয়ে যায়, তবে তার জন্য ওই রাতের পুরো সময় স্ত্রী সহবাস হারাম। এই হুকুম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পক্ষ হতে ছিল এবং কুরআনের কোথাও এর উল্লেখ নেই। একবার কতিপয় মুসলমানের দ্বারা এই বিধান লঙ্ঘিত হয়ে যায়। তারা ইফতার করার পর ঘুমিয়ে পড়ে রাতে উঠে স্ত্রীদের সাথে সঙ্গম করে ফেলে। এই ঘটনার উল্লেখ করে প্রথমে কুরআনের সেসব লোকের নিন্দা ও তিরস্কার করা হয়েছে, অতঃপর ভবিষ্যতের জন্য এ বিধান রহিত করে মুসলমানদের জন্য অনুমতির দেওয়া হয় যে ইফতারের পর রাতের যে কোন অংশে স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে পারবে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কুরআনুল কারীমে বলেন,

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ.

অর্থঃ রোজার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরাও তাদের পোশাক। আল্লাহ অবগত রয়েছেন যে, তোমরা আত্মপ্রতারণা করছিলে। সুতরাং তিনি তোমাদের ক্ষমা করেছেন এবং তোমাদের অব্যাহতি দিয়েছেন। অতঃপর তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করো এবং যা কিছু তোমাদের জন্য আল্লাহ দান করেছেন, তা আহরণ করো। আর পানাহার করো যতক্ষণ না কালো রেখা থেকে ভোরের শুভ্ররেখা পরিষ্কার দেখা যায়। অতঃপর রোজা পূর্ণ কর রাত পর্যন্ত। আর যতক্ষণ তোমরা এতেকাফ অবস্থায় মসজিদে অবস্থান করো, ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা নয়। এই হল আল্লাহ কর্তৃক বেঁধে দেওয়া সীমানা। অতএব, এর কাছেও যেও না। (সূরা আল-বাকারাঃ ১৮৭)

এ আয়াতে '**তোমরা আত্মপ্রতারণা করছিলে। সুতরাং তিনি তোমাদের ক্ষমা করেছেন**' থেকে প্রমাণ হয় রামাদানের পূর্বে থেকেই এই নিষেধাজ্ঞা ছিলো মুসলিমদের জন্য। কারণ নিষেধাজ্ঞা না থাকলে ক্ষমা করার কোন প্রশ্ন আসতো না। কিন্তু সমগ্র কুরয়আনুল কারীমে এ সংক্রান্ত কোন আয়াত পাওয়া যায় না। তাহলে এ থেকে বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই এই নির্দেশ জারি করেছিলেন। এতদাসত্ত্বেও আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা '**এবং তোমাদের অব্যাহতি দিয়েছেন**' দ্বারা এই নির্দেশকে নিজের নির্দেশ বলেছেন। কারণ অব্যাহতি দেবার প্রশ্নতো তখনই আসে যখন আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা নিজেই পূর্বে কোন নির্দেশ দিয়ে থাকেন।

৩) **বদরের যুদ্ধের সময় অগ্রীম বিজয়ের সংবাদঃ**

বদরের যুদ্ধের প্রাক্কালে, দুইটি দল মুসলিমদের দিকে আসছিলো। দুটি দলের একটি ছিলো আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে, আরেকটি আবু জাহেলের নেতৃত্বে কাফেরের দল। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা মুসলমানদেরকে ওয়াদা করেছিলেন যেকোন একটি দলের উপর বিজয় দান করবেন। মুসলমানরা আবু জাহেলের বাহিনীর উপর বদরের প্রান্তরে বিজয় লাভ করেছিলো। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কুরআনুল কারীমে বলেন,

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ...

অর্থঃ যখন আল্লাহ দুটি দলের একটির ব্যাপারে তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, সেটি তোমাদের হস্তগত হবে... (সূরা আল-আনফালঃ ৭)

কিন্তু কুরআনুল কারীমের কোথাও উল্লেখ নেই যে, এই বিজয় দানের কথা বদরের যুদ্ধের পূর্বেই জানিয়েছিলেন। বরং

এ সুসংবাদ মুসলমানদের স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন মাজীদের কোন আয়াত ব্যতীত নিজেই দিয়েছেন। অথচ '**যখন আল্লাহ দুটি দলের একটির ব্যাপারে তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছিলেন**' এই আয়াতের দ্বারা প্রদত্ত সুসংবাদকে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা নিজের দিকে সম্পর্কযুক্ত করেছেন যে, তিনিই এই সুসংবাদ দিয়েছিলেন।

৪) **বদরের যুদ্ধে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার পক্ষ থেকে ফেরেশতা পাঠানোর সংবাদঃ**

উহুদ যুদ্ধের প্রাক্কালে, কুরআন কারীমের কয়েকটি আয়াত নাযিল হয় মুসলমানদেরকে বদর যুদ্ধের ঘটনা ও অবস্থা আবার স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য। কীভাবে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তাদের সাহায্য করেছিলেন। ফেরেশতাদের মাধ্যমে যে সাহায্যের অঙ্গীকার করেছিলেন এবং পরবর্তীতে তার বাস্তবায়নও করেছিলেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কুরআনুল কারীমে বলেন,

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ.

অর্থঃ বস্তুত আল্লাহ বদরের যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল। কাজেই আল্লাহকে ভয় করতে থাকো, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো। আপনি যখন বলতে লাগলেন মুমিনগণকে, তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের সাহায্যার্থে তোমাদের পালনকর্তা আসমান থেকে তিন হাজার ফেরেশতা অবতীর্ণ করবেন? অবশ্য তোমরা যদি সবর করো এবং বিরত থাকো আর তারা যদি তখনই তোমাদের উপর চড়াও হয়, তাহলে তোমাদের পালনকর্তা চিহ্নিত ঘোড়ার উপর পাঁচ হাজার ফেরেশতা তোমাদের সাহায্য পাঠাতে পারেন। বস্তুত এটা তো আল্লাহ তোমাদের সুসংবাদ দান করলেন, যাতে তোমাদের মনে এতে সান্ত্বনা আসতে পারে। আর সাহায্য শুধু পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী আল্লাহরই পক্ষ থেকে। (সূরা আলে-ইমরানঃ ১২৩-১২৬)

বদরের যুদ্ধের সময় আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা যে ফেরেশতাদের সাহায্য করার সুসংবাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে তাঁর সাহাবীদের দিয়েছিলেন, তা আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা নিজের দিকে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। কিন্তু বদর যুদ্ধের সময় প্রদত্ত এই সুসংবাদ কুরআনের কোথাও উল্লেখ পাওয়া যায় না।

৫) **রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তাঁর স্ত্রী কর্তৃক গোপন তথ্য ফাঁসের ঘটনা প্রকাশঃ**

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় পবিত্র স্ত্রীগণের মধ্য হতে একজনকে একটি গোপন কথা বলেছিলেন, কিন্তু তিনি ঐ গোপন কথাটি অন্যের কাছে ফাঁস করে দেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই স্ত্রীর কাছে এর ব্যাখ্যা চাইলে তিনি উল্টো জিজ্ঞাসা করলেন, গোপন তথ্য ফাঁসের সংবাদ আপনাকে কে দিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আমাকে অবগত করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কুরআনুল কারীমে বলেন,

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ.

অর্থঃ যখন নবী তাঁর একজন স্ত্রীর কাছে একটি কথা গোপনে বললেন, অতঃপর স্ত্রী যখন তা বলে দিল এবং আল্লাহ নবীকে তা জানিয়ে দিলেন, তখন নবী সে বিষয়ে স্ত্রীকে কিছু বললেন এবং কিছু বললেন না। নবী যখন তার স্ত্রীকে বললেন, তখন স্ত্রী বললেনঃ কে আপনাকে এ সম্পর্কে অবহিত করল? নবী বললেন, যিনি সর্বজ্ঞ, ওয়াকিফহাল, তিনি আমাকে অবহিত করেছেন। (সূরা আত-তাহরীমঃ ৩)

এখানে '**যিনি সর্বজ্ঞ, ওয়াকিফহাল, তিনি আমাকে অবহিত করেছেন**' এই কথার দ্বারা কুরআনুল কারীমে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলতেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা গোপন কথা ফাঁসের ঘটনা তাঁকে জানিয়েছেন। এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন বলা হয়েছে, কিন্তু একথা বলা নেই যে, আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেছেন। আবার সমগ্র কুরআন মাজীদে এমন কোন আয়াতও পাওয়া যায় না, যেখানে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গোপন তথ্য ফাঁসের কথা উল্লেখ করেছেন। এথেকে বুঝা যায়, আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কুরআনের বাহিরেও ওহী প্রেরণ করেছিলেন এ ঘটনা প্রকাশ করার জন্য।

৬) **<u>বনু নাযীরদের দূর্গ অবরোধের সময় খেজুর গাছ কাটার অনুমতিঃ</u>**

মদিনার প্রসিদ্ধ ইহুদী গোত্র বনু নাযীরকে অবরোধের সময় কতিপয় মুসলমান অবরুদ্ধদের হাতিয়ার সমর্পণ করতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে দূর্গের আশেপাশের খেজুর গাছ কেটে দেয়। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে ইয়াহুদীরা এ ব্যাপারে অভিযোগ করলে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ওহী নাযিল করে বলেন, তিনিই এই নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কুরআনুল কারীমে বলেন,

مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ.

অর্থঃ তোমরা যে কিছু কিছু খেজুর বৃক্ষ কেটে দিয়েছ এবং কতক না কেটে ছেড়ে দিয়েছে; তা তো আল্লাহরই আদেশ। (সূরা হাশরঃ ৫)

অথচ, ইহুদীদের দূর্গ বিজয়ের পূর্বে যখন মুসলমানরা গাছ কেটে ফেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে তখন ঐ সময়ে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার নির্দেশ সংক্রান্ত কোন আয়াত সমগ্র কুরআনুল কারীমে পাওয়া যায় না।

৭) **<u>যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) কর্তৃক যায়নাব বিন্তে জাহাশ (রা.)-কে তালাক প্রদানঃ</u>**

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাইয়্যেদুনা হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.)-কে স্বীয় পুত্র সাব্যস্ত করেছিলেন এবং তার বিবাহ যায়নাব বিনতে জাহাশ (রা.) এরসাথে হয়েছিল। কিন্তু তাদের মধ্যকার সম্পর্ক মধুর ছিলো না। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকে নির্দেশ দিলেন, যায়নাব (রা.) যায়েদ (রা.) থেকে তালাক হয়ে গেলে তিনি যেন তাকে বিবাহ করে নেন। যেহেতু সেকালের প্রথা অনুযায়ী পালক পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করা অত্যন্ত ঘৃণিত ও গর্হিত কাজ ছিলো, তাই শুরুতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে কিছুটা দোদুল্যমান ছিলেন এবং যায়েদ (রা.)-কে বিপরীতে পরামর্শ দেন তাদের মধ্যকার সম্পর্ক মধুর রাখার জন্য এবং তাকে তালাক না দেবার জন্য। কিন্তু পরবর্তীতে তালাক হয়ে যায় এবং যায়নাব বিনতে জাহাশ (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিবাহে আবদ্ধ হন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কুরআনুল কারীমে বলেন,

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا.

অর্থঃ আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন; আপনিও যাকে অনুগ্রহ করেছেন; তাকে যখন আপনি বলেছিলেন, তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই থাকতে দাও এবং আল্লাহকে ভয় করো। আপনি অন্তরে এমন বিষয় গোপন করছিলেন, যা আল্লাহ পাক প্রকাশ করে দেবেন। আপনি লোকনিন্দার ভয় করেছিলেন অথচ আল্লাহকে অধিক ভয় করা উচিত। অতঃপর যায়েদ যখন যায়নাবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করলাম যাতে মু'মিনদের পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেসব স্ত্রীকে বিবাহ করার ব্যাপারে মু'মিনদের কোন অসুবিধা না থাকে। আল্লাহ্‌র নির্দেশ কার্যে পরিণত হয়েই থাকে। (সূরা আল-আহযাবঃ ৩৭)

এখানে '**যখন আপনি বলেছিলেন, তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই থাকতে দাও এবং আল্লাহকে ভয় করো। আপনি অন্তরে এমন বিষয় গোপন করছিলেন**' এই কথার দ্বারা বুঝা যায়, তিনি আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার পক্ষ থেকে ওহীপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। অথচ সমগ্র কুরআন মাজীদে এই ওহী নাযিলের সময় সংক্রান্ত কোন আয়াত পাওয়া যায় না।

আবার '**অতঃপর যায়েদ যখন যায়নাবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করলাম**' এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলছেন, এই বিবাহ তিনিই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে করিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এই বিবাহ করিয়ে দেওয়া সংক্রান্ত কোনও আয়াত সমগ্র কুরআন মাজীদে পাওয়া যায় না।

৮) **নামাযের আদায়ের পদ্ধতির শিক্ষা ও নামাযের সংখ্যা নির্ণয়ঃ**

কুরআনুল কারীমে মুসলমানদের নামায কায়েম করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অনেক আয়াতে। কিন্তু কিছু বিশেষ অবস্থায় এই নামাযের আদায়ের পদ্ধতির ব্যাপারে বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়েছে যে, যদি তারা যুদ্ধের অবস্থা থাকে এবং শত্রুদের পক্ষ থেকে আক্রমণে ভয় থাকে, এমন পরিস্থিতিতে ঘোড়া ও উটের উপর আরোহণ কিংবা চলন্ত অবস্থায় নামায আদায় করতে পারবে। কিন্তু যখন আক্রমণের আশঙ্কা দূর হয়ে যায় তখন স্বাভাবিক নিয়মে নামায আদায় করার হুকুম ফিরে আসবে। আবার বলা হয়েছে, মধ্যবর্তী নামযের ব্যাপারে যত্নবান হবার জন্য। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কুরআনুল কারীমে বলেন,

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ.

অর্থঃ সকল নামাযের প্রতি যত্নবান হও। বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের ব্যাপারে। আর আল্লাহর সামনে একান্ত আদবের সাথে দাঁড়াও। অতঃপর যদি তোমাদের কারো ব্যাপারে ভয় থাকে, তাহলে পদচারী অবস্থাতেই পড়ে নাও অথবা সওয়ারীর উপরে। অতঃপর যখন তোমরা নিরাপত্তা পাবে, তখন আল্লাহকে স্মরণ করো, যেভাবে তোমাদের শেখানো হয়েছে, যা তোমরা ইতোপূর্বে জানতে না। (সূরা আল-বাকারাঃ ২৩৮-২৩৯)

এখানে '**অতঃপর যখন তোমরা নিরাপত্তা পাবে, তখন আল্লাহকে স্মরণ করো, যেভাবে তোমাদের শেখানো হয়েছে**' এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, নামায পড়ানোর পদ্ধতি সম্পর্কে অতীতে শিখানো হয়েছে। কিন্তু সমগ্র কুরআন মাজীদে পাওয়া যায় না।

আবার '**সকল নামাযের প্রতি যত্নবান হও। বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের ব্যাপারে**।' এই আয়াতের মধ্যবর্তী নামাযের গুরুত্বারোপ করেছেন। কিন্তু নামাযের প্রকৃত সংখ্যা কতো, অথবা মধ্যবর্তী নামায কিভাবে গণনা করা হবে, (সকালের ফযর থেকে রাতের ঈশা, নাকি আরবী দিন শুরুর হিসেবে মাগরিব থেকে আসর) এসব সংক্রান্ত কোন আয়াতও কুরআন মাজীদে পাওয়া যায় না। বরং এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত পাওয়া যায় একমাত্র হাদীসে নববীতে। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিখানোকেই আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা নিজের শিখানো বলে সাব্যস্ত করেছেন উপরে উল্লেখিত আয়াতে।

৯) **খাইবার যুদ্ধে মুনাফিকদের অংশগ্রহণে নিষেধাজ্ঞাঃ**

হুদাইবিয়ার গুরুত্বপূর্ণ সময়ে মুনাফিকরা ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অংশগ্রহণ করে নাই। পরবর্তীতে খাইবারের যুদ্ধের প্রস্তুতির সময় তিনি ঘোষণা দেন যে, যারা হুদাইবিয়ায় অংশগ্রহণ করে নাই, তারা খাইবারের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। কিন্তু বিপল গণিমত লাভের আশায় মুনাফিকরা খাইবার যুদ্ধে অংশগ্রহণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। তাদের বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের অনুমতি দেননি। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কুরআনুল কারীমে বলেন,

سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ...

অর্থঃ তোমরা যখন যুদ্ধলব্ধ ধন-সম্পদ সংগ্রহের জন্য যাবে, তখন যারা পশ্চাতে থেকে গিয়েছিল, তারা বলবে- আমাদেরকেও তোমাদের সঙ্গে যেতে দাও। তারা আল্লাহ কালাম পরিবর্তন করতে চায়। বলুন, তোমরা কখনোও আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে না। আল্লাহ পূর্ব থেকে এরূপ বলে দিয়েছেন... (সূরা আল-ফাতহঃ ১৫)

এখানে '**আল্লাহ পূর্ব থেকে এরূপ বলে দিয়েছেন**' বলা হলেও, কুরআন মাজীদে এরূপ কোনও আয়াত পাওয়া যায় না যেখানে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেছেন যে শুধু হুদাইবিয়ায় অংশগ্রহণকারীরাই খাইবারের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারবে। আবার আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই নির্দেশকে নিজের বলে ঘোষণা করেছেন।

১০) **কুরআনের ব্যাখা প্রদানঃ**

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কুরআনুল কারীমে বলেন,

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ.

অর্থঃ তাড়াতাড়ি শিখে নেওয়ার জন্য আপনি দ্রুত আবৃত্তি করবেন না। এর সংরক্ষণ ও পাঠ আমারই দায়িত্ব। অতঃপর আমি যখন তা পাঠ করি, তখন আপনি সেই পাঠের অনুসরণ করুন। এর উপর বিশদ বর্ণনা আমারই দায়িত্ব। (সূরা আল-ক্বিয়ামাহঃ ১৬-১৯)

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নিজের দায়িত্বে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, আপনার কাছে কুরআনুল কারীমের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হবে। অর্থাৎ এই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ কুরআন থেকে ভিন্ন জিনিস। আবার কুরআন মাজীদের যতো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পাওয়া যায়, তার সকল কিছুই কুরআন মাজীদ থেকে পাওয়া যায় না, বরং ওহী গায়রে মাতলু তথা হাদীসে নববীতে পাওয়া যায়।

১১) **রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুরআন, হিকমাহ ও অজানা বিষয়ের শিক্ষা দেয়াঃ**

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কুরআনুল কারীমে বলেন,

وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

অর্থঃ আল্লাহ আপনার প্রতি ঐশীগ্রন্থ (কিতাব) ও প্রজ্ঞা (হিকমাহ) অবতীর্ণ করেছেন এবং আপনাকে এমন বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন যা আপনি জানতেন না। আপনার প্রতি আল্লাহর করুণা অসীম। (সূরা আন-নিসাঃ ১১৩)

এই আয়াতের মধ্যে হিকমাহকে কিতাব হতে পৃথক ও স্বতন্ত্র রুপে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, হিকমাহ হচ্ছে কিতাব হতে ভিন্ন জিনিস যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল হয়েছে। এরপর আরো উল্লেখ করে হয়েছে যে, আপনাকে ওইসব কথা জানানো হয়েছে যা আপনি জানতেন না। এখানে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলছেন, শুধু কিতাবই দেননি বরং হিকমাহও দিয়েছেন এবং একই সাথে এমন বিষয়ের শিক্ষাও দেওয়া হয়েছে যা তিনি পূর্বে জানতেন না।

মুসলমানদেরকে কুরআন তিলাওয়াত, হিকমাহ ও অজানা বিষয়ের শিক্ষা দেয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দায়িত্ব ছিলো। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কুরআনুল কারীমে বলেন,

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

অর্থঃ আল্লাহ ঈমানদারদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে নবী পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন। তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও কাজের কথা শিক্ষা দেন। বস্তুতঃ তারা ছিল পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট। (সূরা আলে-ইমরানঃ ১৬৪)

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কুরআনুল কারীমে আরোও বলেন,

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

অর্থঃ তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তার আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত। (সূরা আল-জুমুআঃ ২)

এখন সমগ্র কুরআন মাজীদ খুজলেও এই হিকমাহ ও অজানা বিষয় সম্পর্কে কোন কিছু জানা যায় না। এথেকে বুঝা যায়, আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আলাদা ওহী নাযিল করে এর শিক্ষা দিয়েছেন।

উপরের সমগ্র আলোচনা থেকে প্রমাণ হয়, আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিলকৃত ওহী মাতলু, যা কুরআন মাজীদের অংশ এবং যা তিলাওয়াত করা হয় ছাড়াও আলাদা ওহী নাযিল করেছেন, যা কুরআন মাজীদের অংশ নয়। এই প্রকার ওহীকেই ওহী গায়রে মাতলু বলা হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য সংক্রান্ত আয়াত

আমরা পূর্বে দেখেছি যে, ওহী দুই প্রকার – ওহী মাতলু এবং ওহী গায়রে মাতলু। এখন কুরআনের পাশাপাশি নবী মুহাম্মাদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখের বাণী যা ওহী গায়রে মাতলু হিসেবে পরিচিত, তা মানতে হবে এ সংক্রান্ত বহু আয়াত পবিত্র কুরআনুল কারীম থেকেই দেখতে পাই। নিম্নে কিছু আয়াত উপস্থাপন করা হল যেখানে স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলছেন, তাঁর আনুগত্যের পাশাপাশি নবী মুহাম্মাদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও আনুগত্য করে চলার জন্য।

১) **সূরা আলে-ইমরান থেকেঃ**

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

অর্থঃ বলুন, আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য প্রকাশ কর। বস্তুতঃ যদি তারা বিমুখতা অবলম্বন করে, তাহলে আল্লাহ কাফেরদিগকে ভালবাসেন না। (আয়াতঃ ৩২)

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

অর্থঃ আর তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ ও রাসূলের, যাতে তোমাদের উপর রহমত করা হয়। (আয়াতঃ ১৩২)

২) **সূরা আন-নিসা থেকেঃ**

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ

অর্থঃ যে কেউ আল্লাহ ও রাসূলের আদেশমত চলে, তিনি তাকে জান্নাত সমূহে প্রবেশ করাবেন, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এ হল বিরাট সাফল্য। যে কেউ আল্লাহ ও রাসূলের

অবাধ্যতা করে এবং তার সীমা অতিক্রম করে তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সে সেখানে চিরকাল থাকবে। তার জন্যে রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। (আয়াতঃ ১৩-১৪)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা বিচারক তাদের। (আয়াতঃ ৫৯)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ

অর্থঃ বস্তুতঃ আমি একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি, যাতে আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী তাঁদের আদেশ-নিষেধ মান্য করা হয়। (আয়াতঃ ৬৪)

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَـٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَـٰئِكَ رَفِيقًا

অর্থঃ আর যে কেউ আল্লাহর হুকুম এবং তাঁর রাসূলের হুকুম মান্য করবে, তাহলে যাঁদের প্রতি আল্লাহ নেয়ামত দান করেছেন, সে তাঁদের সঙ্গী হবে। তাঁরা হলেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। আর তাদের সান্নিধ্যই হল উত্তম। (আয়াতঃ ৬৯)

৩) **সূরা আল-মায়িদাহ থেকেঃ**

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا

অর্থঃ তোমরা আল্লাহর অনুগত হও, রাসূলের অনুগত হও এবং আত্মরক্ষা কর। (আয়াতঃ ৯২)

৪) **সূরা আল-আনফাল থেকেঃ**

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

অর্থঃ অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজেদের অবস্থা সংশোধন করে নাও। আর আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের হুকুম মান্য কর, যদি ঈমানদার হয়ে থাক। (আয়াতঃ ১)

وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

অর্থঃ যে লোক আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য হয়, নিঃসন্দেহে আল্লাহর শাস্তি অত্যন্ত কঠোর। (আয়াতঃ ১৩)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য কর এবং শোনার পর তা থেকে বিমুখ হয়ো না। (আয়াতঃ ২০)

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا

অর্থঃ আর আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মান্য কর এবং তাঁর রাসূলের। তাছাড়া তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হইও না। (আয়াতঃ ৪৬)

৫) **সূরা আত-তাওবা থেকেঃ**

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ

অর্থঃ তারা কি একথা জেনে নেয়নি যে, আল্লাহর সাথে এবং তাঁর রাসূলের সাথে যে মোকাবেলা করে তার জন্যে নির্ধারিত রয়েছে দোযখ; তাতে সব সময় থাকবে। এটিই হল মহা-অপমান। (সূরা আত-তাওবাঃ ৬৩)

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَـٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

অর্থঃ আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা ভাল কথার শিক্ষা দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে। নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। এদেরই উপর আল্লাহ তা'আলা দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশীল, সুকৌশলী। (আয়াতঃ ৭১)

৬) **সূরা আন-নূর থেকেঃ**

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ – وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

অর্থঃ মুমিনদের বক্তব্য কেবল এ কথাই যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে তাদেরকে আহবান করা হয়, তখন তারা বলেঃ আমরা শুনলাম ও আদেশ মান্য করলাম। তারাই সফলকাম। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর শাস্তি থেকে বেঁচে থাকে তারাই কৃতকার্য। (আয়াতঃ ৫১ ~ ৫২)

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

অর্থঃ বলুনঃ আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তার উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্যে সে দায়ী এবং তোমাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্যে তোমরা দায়ী। তোমরা যদি তাঁর আনুগত্য কর, তবে সৎ পথ পাবে। রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টরূপে পৌছে দেয়া। (আয়াতঃ ৫৪)

৭) **সূরা আল-আহযাব থেকেঃ**

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

অর্থঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়। (আয়াতঃ ৩৬)

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

অর্থঃ যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে। (আয়াতঃ ৭১)

৮) **সূরা মুহাম্মাদ থেকেঃ**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ

অর্থঃ হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের (সাঃ) আনুগত্য কর এবং নিজেদের কর্ম বিনষ্ট করো না। (আয়াতঃ ৩৩)

৯) **সূরা আল-হুজরাত থেকেঃ**

وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

অর্থঃ যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, তবে তোমাদের কর্ম বিন্দুমাত্রও নিস্ফল করা হবে না। নিশ্চয়, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম মেহেরবান। (আয়াতঃ ১৪)

১০) **<u>সূরা মুজাদালাহ থেকেঃ</u>**

فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

অর্থঃ তখন তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর। আল্লাহ খবর রাখেন তোমরা যা কর। (আয়াতঃ ১৩)

১১) **<u>সূরা আত-তাগাবুন থেকেঃ</u>**

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

অর্থঃ তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলুল্লাহর আনুগত্য কর। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমার রাসূলের দায়িত্ব কেবল খোলাখুলি পৌছে দেয়া। (আয়াতঃ ১২)

১২) **<u>সূরা আল-জ্বীন থেকেঃ</u>**

وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا

অর্থঃ যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে, তার জন্যে রয়েছে জাহান্নামের অগ্নি। তথায় তারা চিরকাল থাকবে। (আয়াতঃ ২৩)

আবার কিছু আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা শুধুমাত্র এককভাবে নবী মুহাম্মাদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যের কথা বলেছেন এবং তাঁর বিরোধিতা করতে নিষেধ করেছেন। আবার কখনো শুধুমাত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করার চরম পরিণতির কথাও উল্লেখ করেছেন।

১) **<u>সূরা আন-নিসা থেকেঃ</u>**

يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ

অর্থঃ সেদিন কামনা করবে সে সমস্ত লোক, যারা কাফের হয়েছিল এবং রাসূলের নাফরমানী করেছিল, যেন যমীনের সাথে মিশে যায়। (আয়াতঃ ৪২)

مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

অর্থঃ যে লোক রাসূলের হুকুম মান্য করবে সে আল্লাহরই হুকুম মান্য করল। (আয়াতঃ ৮০)

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

অর্থঃ যে কেউ রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সব মুসলমানের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ঐ দিকেই ফেরাব যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থান। (আয়াতঃ ১১৫)

২) **<u>সূরা আন-নূর থেকেঃ</u>**

وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

অর্থঃ তোমরা যদি তাঁর আনুগত্য কর, তবে সৎ পথ পাবে। রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টরূপে পৌছে দেয়া। (আয়াতঃ ৫৪)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

অর্থঃ নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও। (আয়াতঃ ৫৬)

৩) **<u>সূরা আশ-শুরা থেকেঃ</u>**

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ

অর্থঃ কোন মানুষের জন্য এমন হওয়ার নয় যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন। কিন্তু ওহীর মাধ্যমে অথবা পর্দার অন্তরাল থেকে অথবা তিনি কোন দূত প্রেরণ করবেন, অতঃপর আল্লাহ যা চান, সে তা তাঁর অনুমতিক্রমে পৌঁছে দেবে। নিশ্চয় তিনি সর্বোচ্চ প্রজ্ঞাময়। (আয়াতঃ ৫১)

কুরআনুল কারীমের উপরোক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায়, প্রত্যেক মুসলমানের উচিৎ সর্বদা রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ বা ইত্তেবা সংক্রান্ত আয়াত

রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুধু আনুগত্য করলেই হবে না, তাঁর পরিপূর্ণ ইত্তেবা বা অনুসরণও করতে হবে। এ সংক্রান্ত কিছু আয়াত কুরআনুল কারীম থেকে তুলে ধরা হল।

১) **<u>সূরা আল-বাকারা থেকেঃ</u>**

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ

অর্থঃ আপনি যে কেবলার উপর ছিলেন, তাকে আমি এজন্যই কেবলা করেছিলাম, যাতে একথা প্রতীয়মান হয় যে, কে রাসূলের অনুসারী থাকে আর কে পিঠটান দেয়। (আয়াতঃ ১৪৩)

২) **<u>সূরা আলে-ইমরান থেকেঃ</u>**

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

অর্থঃ বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহ ও তোমাদিগকে ভালবাসেন এবং তোমাদিগকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। (আয়াতঃ ৩১)

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ

অর্থঃ হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা সে বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি যা তুমি নাযিল করেছ, আমরা রাসূলের অনুগত হয়েছি। অতএব, আমাদিগকে মান্যকারীদের তালিকাভুক্ত করে নাও। (আয়াতঃ ৫৩)

৩) **<u>সূরা আল-আরাফ থেকেঃ</u>**

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ... فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

অর্থঃ সেসমস্ত লোক, যারা আনুগত্য অবলম্বন করে এ রাসূলের, যিনি উম্মী নবী, যাঁর সম্পর্কে তারা নিজেদের কাছে রক্ষিত তওরাত ও ইঞ্জিলে লেখা দেখতে পায়... সুতরাং তোমরা সবাই বিশ্বাস স্থাপন করো আল্লাহর উপর তাঁর প্রেরিত উম্মী নবীর উপর, যিনি বিশ্বাস রাখেন আল্লাহর এবং তাঁর সমস্ত কালামের উপর। তাঁর অনুসরণ কর যাতে সরল পথপ্রাপ্ত হতে পার। (আয়াতঃ ১৫৭-১৫৮)

৪) **সূরা আল-আনফাল থেকেঃ**

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

অর্থঃ হে নবী, আপনার জন্য এবং যেসব মুসলমান আপনার সাথে রয়েছে তাদের সবার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট। (আয়াতঃ ৬৪)

৫) **সূরা আত-তাওবা থেকেঃ**

لَّقَد تَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ

অর্থঃ আল্লাহ দয়াশীল নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যারা কঠিন মহূর্তে নবীর সঙ্গে ছিল। (আয়াতঃ ১১৭)

৬) **সূরা আল-আহযাব থেকেঃ**

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

অর্থঃ যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে। (আয়াতঃ ২১)

কুরআনুল কারীমের উপরোক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায়, প্রত্যেক মুসলমানের উচিৎ তার ব্যাক্তিগত জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে, অর্থনৈতিক জীবনে, রাজনৈতিক জীবনে তথা সমগ্র কাজে-কর্মে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইত্তেবা বা আনুসরণ করা।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা প্রমাণ পেলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কুরআন মাজীদ ছাড়াও ওহী নাযিল হতো এবং সেই নবীরই আনুগত্য ও অনুসরণ করা তথা ওহীর নির্দেশ মেনে চলা প্রত্যেক মুসলমানদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। অন্যথায় আলাহর পক্ষ থেকে এই দুনিয়া ও আখিরাতে আছে কঠিন আযাব বা শাস্তি।

প্রাথমিক যুগে হাদীস সঙ্কলন ও সংরক্ষণ

হাদীস লিখে রাখার মাধ্যমে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের কিছু ঘটনা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কুরআন মাজীদ লিখে রাখার পাশাপাশি হাদীসে নববী লিখে রাখার প্রতিও গুরুত্ব লক্ষ্য করা যায়। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশেই অনেক সংকলন প্রস্তুত করা হয়েছে। যেমন,

১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরয যাকাতের বিষয়ে শরীয়তের আহকামের একটি বিস্তারিত দস্তাবেজ লিখিয়েছিলেন। এতে বিভিন্ন প্রকার যাকাতযোগ্য সম্পদের উপর যাকাতের ব্যাখ্যা ও পরিমাণ সবিস্তারে উল্লেখ ছিলো। এই দস্তাবেজকে 'কিতাবুস সাদাকাহ' বলা হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন,

أَنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَ كِتابَ الصَّدَقةِ، فلم يُخرِجْه إلى عُمَّالِه حتى قُبِضَ، فقَرَنَه بسَيفِه، فلمَّا قُبِضَ عَمِلَ به أبو بَكرٍ حتى قُبِضَ، وعُمَرُ حتى قُبِضَ، وكان فيه: في خَمسٍ من الإبِلِ شاةٌ...

অর্থঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাত বিষয়ে একটি চিঠি লেখালেন। তিনি গভর্নরদের কাছে তা পাঠানোর পূর্বেই দুনিয়া থেকে চলে যান। তিনি তা নিজের তরবারীর সাথে এঁটে রেখাছিলেন। তাঁর ইন্তিকালের পর হযরত আবু বকর (রা.) এর উপর আমল করেছেন। তার ইন্তিকালের পর হযরত উমর (রা.) এর উপর মৃত্যু পর্যন্ত আমল করেছেন। তাতে লিখা ছিল, 'পাঁচটি উটে একটি বকরি দিতে হবে...' (জামে তিরমিযী, হাদীস ৬২১)

এই দস্তাবেজ হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে যেমন, সুনানে আবু দাউদে উল্লেখ আছে। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হযরত ইমাম যুহরী (রহ.) ছাত্রদের এই কিতাব ক্লাসে পড়াতেন। তিনি বলতেন, 'এটা ঐ দস্তাবেজের মূল অংশ যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদাকাত (যাকাত) সম্পর্কে লিখিয়েছিলেন। এর আসল পাণ্ডুলিপি সাইয়্যিদুনে উমার (রা.) এর ছেলেদের কাছে রয়েছে। হযরত উমরের দৌহিত্র সালেম (রহ.) এটা আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.) হযরত উমরের দৌহিত্র সালেম ও আব্দুল্লাহ থেকে এর একটি নকল হাসিল করেছিলেন। আমার কাছে সেই নকল রয়েছে।'

২) দশম হিজরীতে মুসলমানরা নাজরান বিজয় করলে, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবী হযরত আমর ইবনে হিযাম (রা.)-কে সেখানে গভর্নর নিযুক্ত করেন। তখন হযরত আমর ইবনে হাযম (রা.)-এর উদ্দেশ্যে হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-কে দিয়ে একটি বিস্তারিত দস্তাবেজ লিখিয়েছিলেন। তাতে সধারণ উপদেশের পাশাপাশি পবিত্রতা, নামায, যাকাত-উশর, হজ্ব-উমরা, জিহাদ, গনীমতের সম্পদ ইত্যাদি নানা বিষয় উল্লিখিত ছিল। সাইয়্যিদুনা আমর ইবনে হিযাম (রা.) ইয়ামানের গভর্নর হিসেবে নিজ দায়িত্বে ঐ কিতাবের আলোকে অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে আঞ্জাম দেন। তাঁর ইন্তিকালের পর এ দস্তাবেজ তাঁর পৌত্র আবু বকরের কাছে ছিলো। ইমাম যুহুরী এ পাণ্ডুলিপি তার কাছেই পড়েছেন এবং নকল করেছেন। তিনি স্বীয় ছাত্রদের সে কিতাবও শিক্ষা দিতেন। সেই চিঠিটি বিক্ষিপ্তভাবে রয়েছে ইমাম আবূ দাউদ (রা.) লিখিত 'কিতাবুল মারাসীল' গ্রন্থে। (মাজমূ আতুল ওয়াসাইকিস-সিয়াসিয়াম, ড. হামীদুল্লাহ)

৩) এছাড়াও বিভিন্ন গভর্নরদের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন সময়ে দস্তাবেজ লিখিয়েছিলেন। যাতে ঐ নির্দেশ অনুযায়ী সে বিচারক বা কাজী হিসেবে নিজের জিম্মাদারী ও দায়িত্ব ভালোভাবে আঞ্জাম দিতে পারেন।

ক. যখন তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা.) ও হযরত আলা ইবনে হাযরামী (রা.)-কে হিজরের লোকদের নিকট দূত বানিয়ে প্রেরণ করেন। তখন যাকাত ও উশর সম্পর্কে শরীয়তের বিভিন্ন বিধি-বিধান সংবলিত একটি দস্তাবেজ লেখেন।

খ. একইভাবে হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) এবং হযরত মালিক ইবনে মুরারা (রা.)-কে ইয়ামানের গভর্নর বানিয়ে পাঠানোর প্রাক্কালে তাদেরকেও একটি দস্তাবেজ দিয়েছিলেন।

৩) মদীনা থেকে দূরদূরান্তের অঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন আরব গোত্র ইসলাম গ্রহণ করার পর তারা নিজেদের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে প্রেরণ করত। এই প্রতিনিধি দল মদিনা শরীফে একটি উল্লেখযোগ্য সময় অতিবাহিত করত আর সে সময় ইসলামী শিক্ষা অর্জন করতো, কুরআনে কারীম পড়তো এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপদেশমালা শ্রবণ করত। তারা নিজ এলাকায় প্রত্যাবর্তনের সময় তাদের কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবেদন করত যে, তাদের ও তাদের গোত্রের জন্য কিছু নির্দেশনা যেন লিখে দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এ দস্তাবেজ কবুল করেন এবং তাদের জন্য জরুরী ও আবশ্যকীয় বিষয়ে শরীয়তের বিধি-বিধান সংবলিত নির্দেশনা লিখিয়ে দিতেন।

ক. হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর (রা.) ইয়ামান থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাজির হয়েছিলেন। তিনি ফিরে যাওয়ার সময় বললেন,

يا رسولَ اللهِ،... تَكتُبَ لي كتابًا إلى قَومي... فقال لمُعاويةَ: اكتُبْ له...

অর্থঃ আপনি আমার গোত্রের উদ্দেশ্য একখানা চিঠি লিখে দেন। তখন তিনি হযরত মুয়াবিয়ার (রা.)-কে বললেন, তার জন্য চিঠি লিখে দাও। (ইবনে হিশাম, হাদীস ৩/৭৮)

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে দিয়ে তিনটি চিঠি প্রস্তুত করালেন। একটি সায়্যিদুনা ওয়াইল ইবনে হুজর (রা.)-এর ব্যাক্তিগত বিষয় ছিলো এবং বাকি দুইটিতে নামায, যাকাত, মদের নিষেধ, উশর ও অন্যান্য বিষয়ে শরীয়তের আহকাম লিখা ছিলো। (তাবাকাতে ইবনে সা'আদ, ২৮/১; আল-বিসাকুস সিয়াসিয়্যাহ, পৃষ্ঠাঃ ১২৬-১৩০)

খ. মুনকিজ ইবনে হাইয়্যান, যিনি আব্দুল কায়েস গোত্রের একজন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তার দেশে ফেরার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে একটি দস্তাবেজ দিলেন যা নিয়ে তিনি নিজের গোত্রের কাছে আসলেন। কিন্তু তা কারো কাছে প্রকাশ করেননি। অতঃপর তারই প্রচেষ্টায় তার শ্বশুর ইসলাম গ্রহণ করলে তিনি তা তার কাছে তা সোপর্দ করেন। তিনি তা গোত্রের লোকদের সামনে পড়ে শোনালে পুরো গোত্র ইসলাম কবুল করে। আব্দুল কায়েসের প্রসিদ্ধ প্রতিনিধি দল এই ঘটনার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা বুখারী ও মুসলিম শরীফে রয়েছে। (মিরকাত শরহে মিশকাত, ৮৮/১)

গ. গামেদ গোত্রের প্রতিনিধির দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে মুসলমান হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে হযরত উবাই ইবনে কা'আব (রা.)-এর কাছে কুরআন শিক্ষার জন্য পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য একটি কিতাব লেখালেন যাতে শরীয়তের আহকাম বিদ্যমান ছিল।

ঘ. খাস'আম গোত্রের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হল। ইবনে সা'আদ তাদের আগমনে বিশেষ শক্তিশালী রাবীদের উদ্ধৃতিতে নিম্নোক্ত রেওয়ায়েত উল্লেখ করেন,

فقالوا: آمنّا بالله ورسوله وما جاء من عند الله، فاكتب لنا كتابًا نتبع ما فيه، فكتب لهم كتابًا شهد فيه جرير بن عبد الله ومن حضر.

অর্থঃ তারা বলল, আমরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনেছি এবং আল্লাহর পক্ষ হতে যা নাযিল হয়েছে, সবকিছুর উপর। সুতরাং আমাদের জন্য একটি কিতাব লিখে দিন, যার অনুসরণ আমরা করতে পারি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য দস্তাবেজ লিখে দিলেন। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ ও উপস্থিত অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ এর সাক্ষী ছিলেন। (তাবাকাতে ইবনে সা'আদ, ৩৪৮/১)

ঙ. 'সামালা' এবং 'হাদান' নামের গোত্রের প্রতিনিধি দল মক্কা বিজয়ের পর হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য একটি দস্তাবেজ লেখালেন, যাতে যাকাত সম্পর্কে শরীয়াতের আহকাম উল্লেখ ছিল। সইয়্যিদুনা সাবিত ইবনে কায়িস (রা.) ঐ কিতাবের লেখক এবং সা'আদ ইবনে উবাদা ও হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রা.) সাক্ষী ছিলেন। (তাবাকাতে ইবনে সা'আদ, ৩৫৩/১)

চ. সাবিত ইবনে কায়িস 'আসলাম' গোত্রের প্রতিনিধির জন্যও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লেখানো একটি দস্তাবেজ লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এর সাক্ষী হযরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ ও হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) ছিলেন।

এভাবে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসের একাধিক সংকলন প্রস্তুত করেছেন যান, উপর তাঁর জীবদ্দশায় ও তাঁর ওফাতের খুলাফায়ে রাশিদীন ও অন্যান্য সাহাবী আমল করেন এবং সেসব নির্দেশনা গুলো বাস্তবায়ন করেন।

৪) ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন,

ما مِن أصْحَابِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحَدٌ أكْثَرَ حَدِيثًا عنْه مِنِّي، إلَّا ما كانَ مِن عبدِ اللَّهِ بنِ عَمْرٍو؛ فإنَّه كانَ يَكْتُبُ ولَا أكْتُبُ.

অর্থঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে আমার চেয়ে বেশি হাদীসের অধিকারী আর কেউ নেই। তবে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.)-এর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তিনি লিখতেন আর আমি লিখতাম না। (সহীহ বুখারী, হাদীস ১১৩)

এখানে উল্লেখ্য যে, পরবর্তী সময়ে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হাদীস লিখে রাখতেন। এরকম কিছু পাণ্ডুলিপি উনার কাছ থেকে পাওয়া যায়।

৫) ইমাম আবূ দাউদ (রাহ.) সুনানে আবূ দাউদে বর্ণনা করেন,

عن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: كنتُ أكتُبُ كلَّ شيءٍ أسمَعُهُ مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، أُريدُ حِفْظَهُ، فنهَتْني قريشٌ، وقالوا: أتكتُبُ كلَّ شيءٍ تسمَعُهُ ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بشَرٌ يتكلَّمُ في الغضبِ والرِّضا؟! فأمسَكْتُ عَنِ الكِتابِ، فذكَرْتُ ذلك لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأَوْمأَ بإِصْبَعِهِ إلى فِيهِ، فقال: اكتُبْ؛ فوالذي نفْسي بيدِهِ، ما يخرُجُ منه إلَّا حقٌّ.

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর, (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যাই কিছু শুনতাম তা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে লিখে রাখতাম। কুরাইশের লোকজন আমাকে বাধা দিয়ে বলল, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যাই শুনো তা লিখছো? অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো মানুষ! রাগান্বিত ও শান্ত উভয় অবস্থায় কথা বলেন। এরফলে আমি লিখা বন্ধ করে দিলাম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিষয়টি জানালে মুখের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, তুমি লিখতে থাকো। আল্লাহর কসম যার হাতে আমার প্রাণ, এখান থেকে শুধু সত্যই বের হয়। (সুনানে আবূ দাউদ, হাদীস ৩৬৪৬)

৬) হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওইসব সাহাবীদেরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা পড়ালেখা জানতেন। হযরত আনাস (রা.)-এর মা তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে দিয়ে দেন যখন তার বয়স দশ বছর। এরপর তিনি দশ বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করেন। এ সময় তার অসংখ্য হাদীস শোনার সুযোগ হয় এবং তিনি এসব হাদীস লিখে রেখেছিলেন। তার এক শিষ্য ইবনে হেলাল বলেন,

كُنَّا إِذَا أَكْثَرْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْرَجَ إِلَيْنَا مَجَالَّ عِنْدَهُ، فَقَالَ: هَذِهِ سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلم فَكَتَبْتُهَا وَعَرَضْتُهَا عَلَيْهِ.

অর্থঃ যখন আমরা হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.)-এর কাছে অনেক পীড়াপীড়ি করতাম, তো তিনি কিছু মুখস্ত হাদীস পেশ করতেন আর বলতেন, তা সেসব হাদীস যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে শুনেছি ও লিখে রেখেছি। এবং তা সত্যায়নের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থাপন করেছি। (মুসতাদরাকে হাকীম, ৩/৫৭৩-৫৭৪)

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় সাইয়্যিদুনা আনাস (রা.) হাদীসের বিরাট পরিমাণ কয়েক নুসখায় শুধু লিপিবদ্ধই করেননি বরং তা সত্যায়নের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে পেশও করেন এবং তিনি তা সত্যায়ন করে দেন।

এছাড়াও আরোও বহু বর্ণনা রয়েছে যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে জীবদ্দশায় সাহাবায় কিরাম কর্তৃক হাদীস লেখার প্রমাণ বহন করে। (দিরাসাত ফিল হাদীসিন-নাবাউই ওয়া তারীখি তাদওয়ানিহী, ড. মুহাম্মাদ মুস্তফাল-আ'যমী; হুজ্জিয়াতে হাদীস, মূফতি ত্বকী উসমানী)

সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর যুগের কিছু ঘটনা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর সাহাবায়ে কিরামের কাছে হাদীসের অনেক সংকলন পাওয়া যায়। তারাও হাদীসের সংকলন প্রস্তুত করেছিলেন।

১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেশভাবে হাদীস লিখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি হাদীসের একটি বিশাল পাণ্ডুলিপি তৈরী করেছিলেন। এ কিতাবের নাম ছিলো সহীফা সাদীকা বা সত্যভাণ্ডার। বিখ্যাত তাবি'ঈ মুজাহীদ (রহ.) বলেন,

أتيت عَبْد الله بْن عَمْرو، فتناولت صحيفة تحت مفرشه، فمنعني، قلت: ما كنت تمنعني شيئًا، قَالَ: هَذِهِ الصادقة، فيها ما سَمِعْتُ من رَسُول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلم ليس بيني وبينه أحد، إِذَا سلمت لي هَذِهِ وكتابُ اللَّه والوهط، فلا أبالي علام كانت عَلَيْهِ الدنيا؟، والوهط أرض كانت لَهُ يزرعها.

অর্থঃ আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর কাছে উপস্থিত হলাম। তার বিছানার নীচ থেকে একটি পুস্তিকা হাতে নিলাম। তিনি আমাকে তা ধরতে নিষেধ করলেন। আমি বললাম, আপনি তো আমাকে কোনও জিনিস ধরতে নিষেধ করেন না। তিনি বললেন, এটা 'সহীফায়ে সাদীকা'। এতে সেসব হাদীস রয়েছে, যা আমি সরাসরি তাঁর কাছে থেকে শুনেছি। এই সহীফা, আল্লাহ তা'আলার কিতাব ও আমার চাষাবাদের যমীন যদি হিফাযতে থাকে তবে দুনিয়া যে অবস্থায়ই যাক তাতে আমার কোনও পরোয়ান নেই। (উসদুল গাবাহ, ইবনুল আসির, ৩/৩৪৬)

এ পাণ্ডুলিপি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর পর তার বংশধরদের কাছে ছিলো। তার দৌহিত্র আমর ইবনে শোআইব এসব হাদীস শিক্ষা দিতেন। ইয়াহইয়াহ ইবনে মাইন ও আলী ইবনুল মাদিনী (রহ.) বলেন, আমর ইবনে শোআইবের বর্ণনাকৃত প্রত্যেক হাদীস তা যে কোন কিতাবে বিদ্যমান থাকুক, ঐ পাণ্ডুলিপি থেকে নেয়া হয়েছে।

(তাহযীবুত তাহযীব, ৮/৪৯-৫৩) ইবনে আসীর বর্ণনা করেন, ঐ পাণ্ডুলিপির মধ্যে এক হাজার হাদীস ছিলো। (উসদুল গাবাহ, ৩/২৩৪)

২) হযরত আলী (রা.)-এর কাছেও একটি লিখিত পুস্তিকা ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তিনি তা লিখে প্রস্তুত করেছিলেন। হযরত আলী (রা.) ও হযরত মুআবিয়া (রা.) এর মাঝে ইখতিলাফ চলাকালীন সময়ে কিছু মানুষ এ কথা প্রচার করেছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রা.)-কে বিশেষ কিছু দিয়ে গেছেন, যা অন্য সাহাবায়ে কিরাম জানেন না। এমন সময় তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আপনাকে বিশেষ কিছু জানিয়ে গেছেন? তিনি বললেন, না, তবে তরবারীর বাটের মধ্যে যা আছে। এ কথা বলে তিনি একটি পুস্তিকা বের করেন যাতে দিয়াতের কিছু বিধি-বিধান সংক্রান্ত হাদীস লেখা ছিল। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৩০৭; মুসতাদরাকে হাকীম, হাদীস ৯৯৩)

৩) এছাড়াও হযরত আলী (রা.)-এর নিকট হাদীস শরীফের একটি পাণ্ডুলিপি ছিলো। তিনি বলেন,

عن عليٍّ رضي الله عنه قالَ: ما كتَبنا عن رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلم إلاَّ القرآنَ وما في هذِهِ الصَّحيفةِ.

অর্থঃ আমি কুরআনুল কারীম এবং এই পাণ্ডুলিপিতে যা আছে তা ব্যাতীত আর কিছুই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে লিখে রাখিনি। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৩১৭৯)

ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ গ্রন্থে এই পাণ্ডুলিপির আলোচনা করেছেন, যেখান থেকে বুঝা যায় এতে কিয়াস, দিয়্যাত, ফিদয়া, ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা, অমুসলিমদের অধিকার, উত্তরাধিকারের বিশেষ কিছু মাসায়েল, বিভিন্ন বয়সের উটের উপর যাকাতের মূলনীতি এবং মদীনা শহরের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত বিষয় আলোচিত ছিলো। আলী (রা.) তার খিলাফতকালে ইসলামী শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের জন্য এবং তৎসময়ে ছড়িয়ে পরা কিছু বিভ্রান্তি ও ভুল মতবাদের মূলোৎপাটন করার জন্য এই পাণ্ডুলিপি মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য চেষ্টা করেন। ইবনে সা'আদ থেকে বর্ণিত আছে, মসজিদের খুতবাতে হযরত আলী (রা.) বলেন,

علي بن أبي طالب خطب الناس فقال: من يشتري علما بدرهم؟

অর্থঃ আলী (রা.) খুতবাতে বলেন, কে আছে যে আমার কাছ থেকে এক দিরহামের বিনিময়ে ইলম খরিদ করবে?

তখন হারিস আল-আওয়ার কাগজ খরিদ করে হযরত আলী (রা.)-এর কাছে এলে, তিনি তার জন্য অনেক হাদীস লিখে দেন।

৪) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভাই ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের সময় তিনি একেবারে কম বয়সী ছিলেন। হাদীস সংরক্ষণের জন্য তিনি ঐ হাদীস লিপিবদ্ধ করতে আরম্ভ করলেন, যা তিনি সরাসরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন কিংবা অন্য কোন সাহাবীর মাধ্যমে পেয়েছেন। যখন তিনি এমন সাহাবীর সন্ধান পেতেন যার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস রয়েছে, তবে তিনি হাদীস শোনার জন্য সফর করে তার কাছে যেতেন। এসব জমাকৃত হাদীস তিনি অসংখ্য সংকলনে লিপিবদ্ধ করে রাখেন। এ সংকলন এত বিপুল পরিমাণ ছিল যে, তা বহনের জন্য একটি উটের প্রয়োজন পড়তো। অতঃপর এই সংকলন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর শিষ্য কুরাইবের কাছে হস্তান্তর করা হয়। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মুসা ইবনে উকবা বর্ণনা করেন,

موسى بن عُقْبة قال: وضع عندنا كُريب حمل بعير أو عدل بعير من كُتُب ابن عبّاس، قال: فكان عليّ بن عبد الله بن عبّاس إذا أراد الكتاب كتب إليه: ابْعث إليّ بصحيفة كذا وكذا، قال فينسخها فيبعث إليه بإحداهما

অর্থঃ কুরাইব আমাদের জন্য ইবনে আব্বাসের উট ভর্তি কিতাব রেখে গেছেন। যখন আলী ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের কোন কিতাবের প্রয়োজন দেখা দিত, তিনি কুরাইবের কাছে লিখে পাঠাতেন যে, আমার কাছে অমুক অমুক

কিতাব পাঠিয়ে দাও। অতঃপর কুরাইব সেসব কিতাবের নুসখা প্রস্তুত করতেন এবং দুটি নুসখার একটি তার কাছে প্রেরণ করতেন। (তাবাকাতে ইবনে সা'আদ, ৫/৪৯৩)

৫) হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর অন্যান্য সাহাবীদের তুলনায় সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী। তার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৩৭৪ টি বলা হয়ে থাকে। তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পরে আপন জিন্দেগি হাদীস সংরক্ষণ ও বর্ণনা করার জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। অন্যান্য প্রসিদ্ধ সাহাবীদের বিপরীতে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) জীবন ধারণের কোন উপকরণ অবলম্বন করেননি। বরং মসজিদে নববীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন, যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপদেশমালা শুনতে পান এবং তার আশেপাশে প্রকাশিত বিভিন্ন অবস্থা ও প্রত্যেক ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে পারেন। এজন্য আবু হুরায়রা (রা.)-কে ক্ষুদা ও পিপাসার তীব্র যন্ত্রণা এবং অন্যান্য বিপদ ও মুসিবতের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এতদাসত্ত্বেও যে রাস্তা তিনি ধরেছিলেন তার ছাড়েননি।

যদিও তিনি এক সময় হাদীস লিখতেন না, কিন্তু পরবর্তীতে হাদীস লিখতেন এবং তাঁর কাছে একটি সংকলন ছিল। হাসান ইবনে আমর বলেন, 'তিনি আমাকে একদিন তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে তিনি আমাকে হাদীসে নববীর একটি সংকলন দেখালেন।' (ফাতহুল বারী, ১/১৮৪)

এছাড়া আরোও বহু সাহাবী থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস লিখে রাখার বর্ণনা পাওয়া যায়। (দিরাসাত ফিল হাদীসিন-নাবাউই ওয়া তারীখি তাদওয়ানিহী, ড. মুহাম্মাদ মুস্তফাল-আ'যমী)

তাবি'ঈনদের যুগের কিছু ঘটনা

সাহাবায় কিরামের যুগের পর তাবি'ঈনের যুগে হাদীস লিখা ও সংকলনের কাজ আরোও বিস্তৃত পরিসরে চলতে থাকে। তারা ব্যাপকভাবে সাহাবায়ে কিরাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেন এবং তা লিপিবদ্ধ করতে থাকেন। ইমাম আমির ইবনে শারাহীল আশ-শা'বী, ইমাম হাসান বসরী (রহ.) সহ বিখ্যাত অনেক তাবি'ঈ হাদীস সংকলনের কাজ করেন। 'সহীফায়ে হাম্মাম ইবনে মুনাব্বিহ' এই যুগেই প্রস্তুত হয়। হাম্মাম ইবনে মুনাব্বিহ (রহ.) হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে যেসব হাদীস শুনেছেন তা একটি কিতাব আকারে লিপিবদ্ধ করেন।

এই যুগেই হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.) সরকারিভাবে হাদীস সংকলনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। হাদীসে ও ইতিহাসের কিতাবে এই ঘটনার বিবরণ এইভাবে এসেছে,

وَكَتَبَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ إلى أَبِي بَكْرِ ابنِ حَزْمٍ: انْظُرْ ما كانَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى الله عليه وسلم؛ فاكْتُبْهُ؛ فإنِّي خِفْتُ دُرُوسَ العِلْمِ وَذَهابَ العُلَماءِ.

অর্থঃ হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রহ.) আবূ বকর ইবনে হাযমের কাছে চিঠি লেখেন যে, আপনি লক্ষ করুন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যেসব হাদীস রয়েছে তা লেখার ব্যবস্থা করুন। কেননা আমি ইলম মিটে যাওয়া ও উলামায়ে কিরাম চলে যাওয়ার আশঙ্কা করছি। (সহীহ বুখারী, 'কিভাবে ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে' অধ্যায়)

এভাবে প্রত্যেক যুগেই হাদীস সংকলনে কাজ চলতে থাকে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.), ইমাম মালিক (রহ.) সহ অনেক ইমাম এবং অনেক ফক্বীহ ও মুহাদ্দিস হাদীসের অসংখ্য ও অগণিত কিতাব রচনা করেছেন। (দিরাসাত ফিল হাদীসিন-নাবাউই ওয়া তারীখি তাদওয়ানিহী, ড. মুহাম্মাদ মুস্তফাল-আ'যমী; হুজ্জিয়াতে হাদীস, মুফতি ত্বকী উসমানী)

আলোচনা ও মুখস্ত করার মাধ্যমে হাদীস সংরক্ষণ

হাদীস লেখার পাশাপাশি হাদীসকে মুখস্ত করার মাধ্যমেও সংরক্ষণ করা হয়েছে। হাদীস মুখস্ত করার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরামের তাৎপরতা ছিল অনেক বেশি। তারা যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে হাদীস মুখস্ত ও

সংরক্ষণ করার ব্যাপারে যত্নশীল ছিলেন, তেমনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পরে আপন যুগেও হাদীস মুখস্ত ও সংরক্ষণ করার ব্যাপারে মনোযোগী ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের কিছু ঘটনা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে সাহাবায়ে কিরাম কর্তৃক হাদীস লেখা ছাড়াও তা সংরক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। নিচে কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল,

১) হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত,

عن أنس، قال: كنا قعودًا مع نبى الله - صلى الله عليه وسلم – فعسى أن يكون قال: ستين – رجلًا – فيحدّثنا الحديث ثم يدخل لحاجته فنتراجعه بيننا: هذا ثم هذا، فنقوم كأنما زرع في قلوبنا.

অর্থঃ হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বসে থাকতাম। লোক সংখ্যা ষাটের মতো হতো। তিনি আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করে তার প্রয়োজন পূরণে চলে যেতেন। আমরা সেই অবস্থায়ই পরস্পর তা আলোচনা করতাম। এতে যেন তা আমাদের অন্তরে বসে যেত। (মুসনাদে আবু ইয়া'লা, হাদীস ৪০৯১)

২) হযরত মুয়াবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত,

عنِ ابنِ بُرَيْدَةَ، أنَّ مُعاويةَ خَرَجَ مِنْ حَمَّامِ حِمْصَ، فقالَ لغُلامِهِ: ائْتِني بِسِبْتِيَّتَيَّ، فَلَبِسَهُما، ثُمَّ دَخَلَ مَسْجِدَ حِمْصَ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، فلمَّا فَرَغَ إذا هو بِناسٍ جُلوسٍ، فقالَ لَهُمْ: ما يُجْلِسُكُمْ؟ قالوا: صَلَّيْنا صلاةَ المَكْتوبَةِ، ثُمَّ قَصَّ القاصُّ، فلمَّا فَرَغَ قَعَدْنا نَتَذاكَرُ سُنَّةَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.

অর্থঃ হযরত মুয়াবিয়া (রা.) মসজিদে বসা লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কেন বসে আছ? তারা বললেন, আমরা ফরয নামাজ আদায় করার পর একব্যক্তি বয়ান করলেন। এখন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস পরস্পর আলোচনার জন্য বসেছি। (মুসতাদরাকে হাকীম, হাদীস ৩২৫)

সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর যুগের কিছু ঘটনা

সাহাবায়ে কিরামের যুগেও হাদীস সংরক্ষণের কাজ গুরুত্বের সাথে করা হতো। নিচে কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল,

১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: تَذَاكَرُوا هَذَا الْحَدِيثَ، لَا يَنْفَلِتْ مِنْكُمْ.

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, তোমরা পরস্পরে হাদীসের আলোচনা কর। তবে তোমাদের কাছ থেকে তা হারিয়ে যাবে না। (সুনানে দারিমী, হাদীস ৬২৪)

তিনি আরও বলেন,

عن ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: رُدُّوا الْحَدِيثَ وَاسْتَذْكِرُوهُ. فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ تَذْكُرُوهُ، ذَهَبَ.

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, বারবার হাদীসে আলোচনা করো। কারণ হাদীসের আলোচনা না হলে হাতছাড়া হয়ে যাবে। (সুনানে দারিমী, হাদীস ৬২৫)

২) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) তার শিষ্যরা পাণ্ডুলিপি নকল করে তাকে পড়ে শোনাতেন, যাতে তিনি সংশোধন করতে পারেন। (তিরমিযী, ১/২৬১) কখনো কখনো হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) তার ছাত্রদের সামনে হাদীস বর্ণনা করতেন আর ছাত্ররা তা লিখে নিতো। (সুনানে দারেমী, পৃষ্ঠাঃ ১/১০৫-১০৬, হাদীস ৫০৫-৫১০)

৩) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: تَذَاكَرُوا هَذَا الْحَدِيثَ، فَإِنَّ حَيَاتَهُ مُذَاكَرَتُهُ.

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেন, তোমরা হাদীস নিয়ে পরস্পর আলোচনা কর। কেননা তা টিকে থাকে আলোচনার দ্বারা। (সুনানে দারিমী, হাদীস ৬৪৩)

৪) হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেসব প্রসিদ্ধ সাহাবীদের মধ্যে গণ্য যারা অধিক হাদীস বর্ণনা করেছে। হযরত জাবের (রা.) দুটি পাণ্ডুলিপিতে হাদীস লিপিবদ্ধ করেছিলেন। একটি পাণ্ডুলিপিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ হজ্বের বিস্তারিত বর্ণনা ছিল। এই পাণ্ডুলিপির পূর্ণ মতন 'সহীহ মুসলিম শরীফে' আছে, যেখানে হযরত জাবের (রা.) বিদায় হজ্বের বিস্তারিত আলোচনা উল্লেখ করেছেন। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ৩৯৪-৪০০) ইমাম যাহাবী বলেন, এটি মূলত হযরত জাবের (রা.)-এর পাণ্ডুলিপির নকল। (তাযকেরাতুল হুফফায লিয যাহাবী, ১/৪১)

অন্য পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্ন বিষয়ে হাদীস শরীফ লিখেছেন। হযরত জাবের (রা.)-এর প্রসিদ্ধ শিষ্য খ্যাতিমান তাবে'ঈ কাতাদা (রহ.) বলেন,

قال قتادة: لأنا لصحيفة جابر بْن عَبد اللهِ أحفظ مني لسورة البقرة.

অর্থঃ আমার হযরত জাবের (রা.)-এর সহীফা সূরা বাকারার চেয়ে বেশি মুখস্ত আছে। (তাহযীবুত তাহযীব, ৩৫৩৮)

হাদীসের এই পাণ্ডুলিপির হাওয়ালা মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাকে বিদ্যমান আছে। সেখানে ওই নুসখার কিছু হাদীসও বর্ণনা করা হয়েছে। (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাদীস ১১/২০২৭৭)

হাদীসের কিতাবে এছাড়াও রয়েছে প্রচুর দৃষ্টান্ত। সাহাবায়ে কিরাম হাদীস মুখস্ত রাখার ব্যাপারে কতটা যতনবান ছিলেন এসব বর্ণনা থেকে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অনুরূপভাবে তাবি'ঈনের যুগেও এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। তারাও হাদীসে নববীকে সংরক্ষণের জন্য পরস্পর আলোচনাকে অনেক গুরুত্ব দিতেন। (নুসরাতুল হাদীস, মুহাদ্দিসে কাবীর, হাবীবুর রহমান আ'যমী, পৃষ্ঠাঃ ৪২-৪৭)

তাবি'ঈনদের যুগে হাদীসের ব্যাপক সংকলন

সাহাবায়ে কিরামের পরবর্তী যুগে হাদীস সংকলনের ইতিহাসের পরিধি অত্যন্ত প্রশস্ত হয়ে যায়। হাদীস বর্ণনার সম্পৃক্ততায় প্রত্যেক সাহাবীর বহু শিষ্য তৈরি হয়, যারা নিজেদের শ্রবণকৃত হাদীস লিপিবদ্ধ ও সংকলন করেছেন। সাহাবায়ে কিরামের সেসব শিষ্যদের তাবি'ঈন বলা হয়।

তাবি'ঈনদের হাদীস সংকলন সাধারণত বিষয়বৃত্তিক ছিল না। যদিও তাদের মাঝে কতিপয় ব্যাক্তি হাদীসকে বিষয়ভিত্তিক শিরোনামের অধীনে একত্রিত করেছেন। ইমাম শাবী কর্তৃক রচিত 'আল আবওয়াব' কিতাবকে এ প্রকারের সর্বপ্রথম কিতাব মনে করা হয়। এই কিতাব বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেক অধ্যায়ে একই আলোচনার সংক্রান্ত হাদীস একত্র করা ছিলো। (তাদরিবুর রাবী, ৪০) সুতরাং বলা যায় যে, সাধারণ বিন্যাসে সংকলিত হাদীসের প্রথম কিতাব হিজরী প্রথম শতকেই লিখিত হয়েছিলো।

আরেকটি কিতাব যা কুরআনে কারীমের তাফসীর সংক্রান্ত বিষয়ে হাদীস সংবলিত ছিল, তা হযরত হাসান বসরী (রহ.) রচনা করেন। (আসসিত্তাতু কাবলাত তাদবীন ইজাজুল খতীব, ৩৩৮) এটিও সাধারণ বিন্যাস অনুযায়ী নিয়মতান্ত্রিক একটি কিতাব ছিল, যা একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে হিজরী প্রথম শতকেই লেখা হয়।

তাবি'ঈনদের যুগে হাদীস সংকলনের কাজ প্রসিদ্ধ খলীফা হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.) সরকারীভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তিনি সকল গভর্নরদের কাছে সরকারী ফরমান প্রেরণ করেন যে, তারা যেন স্বীয় ব্যক্তিগত পৃষ্ঠপোষকতায় সাহাবায়ে কিরাম এবং তাদের শিষ্যদের মধ্য থেকে জ্ঞানী ব্যক্তিদের সমবেত করেন। আর তাদের হতে অর্জিত সমুদয় হাদীস লিপিবদ্ধ করেন। (ফাতহুল বারী ১৭৪/১)

ঐ সরকারি নির্দেশের ফলাফলে হাদীসের অসংখ্য কিতাব গ্রন্থিত হয়ে পুরো দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ে। আল্লামা ইবনে শিহাব যুহরী (রহ.) হাদীস গ্রন্থনার প্রাথমিক নির্মাতা ও রূপকারদের একজন ছিলেন। তিনি কয়েকটি কিতাব রচনা করেছিলেন। এ সময়, সমস্ত পাণ্ডুলিপি ও কিতাবাদি পরবর্তী সময়ে রচিত কিতাবের মাঝে মিলিত হয়ে যায়। সেসব পাণ্ডুলিপি ও কিতাবাদির ব্যক্তিগত মর্যাদা ও পরিচয়ের প্রয়োজন না থাকার কারণে তা আলোচনায় থাকেনি। এতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিজরী শতকে রচিত বৃহৎ কিতাবাদি ধীরে ধীরে সেগুলোর স্থান দখল করে নেয় এবং অধিক বিস্তারিত, সর্বপ্রসারী ও প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত হওয়ার কারণে বিস্তৃত অঙ্গনে তা এত প্রসিদ্ধ ও গ্রহণীয় হয় যে, তাবি'ঈনদের কিতাবের প্রয়োজনীয়তা কমে যায়। সেসব কিতাবের কয়েকটি পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত ছিল এবং পরবর্তী সময় রচিত কিতাবাদির তুলনা ও যাচাই-বাছাই ঐসব রক্ষিত পাণ্ডুলিপির সাথে করা হতো।

তাবি'ঈনদের যুগে রচিত কিতাবের মাঝে 'সহীফায়ে হাম্মাম ইবনে মুনাব্বিহ' ছিল। হাম্মাম ইবনে মুনাব্বিহ ছিলেন হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর একজন শিষ্য ছিলেন, যিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে শ্রবণকৃত হাদীসের সংকলন তৈরি করেন। ঐ কিতাবের নাম 'আস-সহীফাতুস সহীহাহ' ছিলো। এ কিতাবের সমস্ত হাদীস পরবর্তী সময় অন্যান্য সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় এবং এর পূর্ণ মতন মুসনাদে আহমাদে পাওয়া যায়। তাই মূল পাণ্ডুলিপির প্রয়োজনীয়তা না থাকার কারণে তা নির্জন প্রান্তরে হারিয়ে যায়। পরবর্তীতে ১৪৭৩ হিজরী মোতাবেক ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে সে কিতাবের দুটি হস্তলিখিত কপি জার্মানীর বার্লিন এবং দামেস্কের লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়।

সুতরাং, এ কথা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, তাবি'ঈনদের কিতাব পরবর্তীদের কিতাবে অন্তর্ভুক্ত হয়ে বৃহৎ কিতাবের একটি অংশ হয়ে যায়।

প্রথম হিজরী শতকে রচিত কিছু প্রসীদ্ধ হাদীসের কিতাব

১) কিতাবে খালেদ ইবনে মাদান (মৃত্যু ১০৪ হিজরী)

২) কুতুবে আবু কিলাবা (মৃত্যু ১০৪ হিজরী)

৩) সহীফা হাম্মাম ইবনে মুনাব্বিহ

৪) কুতুবে হযরত হাসান বসরী (২১-১১০ হিজরী)

৫) কুতবে মুহাম্মাদ আল বাকের (৫৬-১১৪ হিজরী)

৬) কুতুবে মাকহুল শামী

৭) কিতাবে হাকাম ইবনে উতবা

৮) কিতাবে বুকাইর ইবনে আব্দুল্লাহ বিন আল আশাজ

৯) কুতুবে কায়েস বিন সা'আদ (মৃত্যু ১১৭ হিজরী)

১০) কিতাবে সুলাইমান আলাইউসকারা

১১) আল-আবওয়াব লিস-সালাবী

১২) কুতুবে ইবনে শিহাব যুহরী

১৩) কিতাবে আবুল আলিয়া

১৪) কিতাবে সাঈদ ইবনে জুবাইর (মৃত্যু ৯৫ হিজরী)

১৫) কুতুবে উমর ইবনে আবদুল আযীয (৬১-১০১ হিজরী)

১৬) কুতুবে মুজাহিদ ইবনে জাবের (মৃত্যু ১০৩ হিজরী)

১৭) কুতুবে রাজা ইবনে হাইওয়া (মৃত্যু ১১২ হিজরী)

১৮) কিতাবে আবু বকর বিন মুহাম্মাদ বিন আমর ইবনে হাজম

১৯) কিতাবে বুশাইর বিন নুহাইক

দ্বিতীয় হিজরী শতকে রচিত কিছু প্রসীদ্ধ হাদীসের কিতাব

১) কিতাবে আব্দুল মালেক বিনে জুরাইব (মৃত্যু ১৫০ হিজরী)

২) মুওয়াত্তা ইমাম মালেক বিন আনাস (৯৩-১৭৯ হিজরী)

৩) মুওয়াত্তা ইবনে আবী জিব (৮০-১৫৩ হিজরী)

৪) মাগাযী মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (মৃত্যু ১৫১ হিজরী)

৫) মুসনাদে রবি বিন সাবিহ (মৃত্যু ১৬০ হিজরী)

৬) কিতাবে সাঈদ বিন আরুবা (মৃত্যু ১৫৬ হিজরী)

৭) কিতাবে হাম্মাদ বিন সালামা (মৃত্যু ১৬৭ হিজরী)

৮) জামে সুফিয়ান আস সাওরী (৯৭-১৬১ হিজরী)

৯) জামে মাআমার বিন রাশেদ (৯৫-১৫৩ হিজরী)

১০) কিতাবে আবদুর রহমান আল-আওজায়ী (৮৮-১৫৭ হিজরী)

১১) কিতাবুয যুহুদ – আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (১১৮-১৮১ হিজরী)

১২) কিতাবে হুসাইম বিন বুশাইর (১০৪-১৮৩ হিজরী)

১৩) কিতাবে জারির বিন আব্দুল হামীদ (১১০-১৮৮ হিজরী)

১৪) কিতাবে আব্দুল্লাহ বিন ওহাব (১২৫-১৯৭ হিজরী)

১৫) কিতাবে ইয়াহইয়াহ বিন আবী কাসীর (মৃত্যু ১২৯ হিজরী)

১৬) কিতাবে মুহাম্মাদ বিন সাওকাহ (মৃত্যু ১৩৫ হিজরী)

১৭) তাফসীরে যায়েদ বিন আসলাম (মৃত্যু ১৩৬ হিজরী)

১৮) কিতাবে মুসা বিন উকবা (মৃত্যু ১৪১ হিজরী)

১৯) কিতাবে আশআস বিন আব্দুল মালেক (মৃত্যু ১৪২ হিজরী)

২০) কিতাবে ওকাইল বিন খালেদ (মৃত্যু ১৪২ হিজরী)

২১) কিতাবে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আনসারী (মৃত্যু ১৪৩ হিজরী)

২২) কিতাবে আউফ বিন আবী জামীলা (মৃত্যু ১৪৬ হিজরী)

২৩) কুতুবে জাফর বিন মুহাম্মাদ সাদেক (মৃত্যু ১৪৮ হিজরী)

২৪) কিতাবে ইউনুস বিন ইয়াজীদ (মৃত্যু ১৫২ হিজরী)

২৫) কিতাবে আবদুর রহমান আল মাসউদী (মৃত্যু ১৬০ হিজরী)

২৬) কুতুবে যায়েদা ইবনে কুদামা (মৃত্যু ১৬১ হিজরী)

২৭) কুতবে ইব্রাহী আত তাহমান (মৃত্যু ১৬৩ হিজরী)

২৮) কুতুবে আবু হামযা আস-সুকরী (মৃত্যু ১৬৭ হিজরী)

২৯) আল গারায়েব শোবা বিন আল হাজাহ (মৃত্যু ১৬৪ হিজরী)

৩০) কুতুবে আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল্লাহ আল মাজেশুন (মৃত্যু ১৬৪ হিজরী)

৩১) কুতুবে আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ বিন আবী উআইস (মৃত্যু ১৬৯ হিজরী)

৩২) কুতুবে সুলাইমান বিন বেলাল (মৃত্যু ১৭২ হিজরী)

৩৩) কুতুবে আব্দুল্লাহ বিন লাহিয়া (মৃত্যু ১৪৭ হিজরী)

৩৪) জামে সুফিয়ান বিন উয়াইনা (মৃত্যু ১৯৮ হিজরী)

৩৫) কিতাবুল আসার ইমাম আবু হানীফা (মৃত্যু ১৫০ হিজরী)

৩৬) মাগাযী মুতামির বিন সুলাইমান (মৃত্যু ১৮৭ হিজরী)

৩৭) মুসান্নাফে ওয়াকি বিন জাররাহ (মৃত্যু ১৯৬ হিজরী)

৩৮) মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক বিন হাম্মাম (১৩৬-২২১ হিজরী)

৩৯) মুসনাদে যায়েদ বিন আলী (৭৬-১২২ হিজরী)

৪০) কুতুবে ইমাম শাফেয়ী (১৫০-২০৪ হিজরী)

প্রথম ও দ্বিতীয় হিজরী শতকের কিছু হাদীসের কিতাব যা এখনও মুদ্রিত হয়

১) মুওয়াত্তা ইমাম মালেক

২) কিতাবুল আসার ইমাম আবু হানীফা

৩) মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক (এগারো খণ্ডে মুদ্রিত)

৪) আস সুহদাহ মুহাম্মাদ বিন ইসহাক

৫) কিতাবুয যুহদ আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক

৬) কিতাবুয যুহদ ওয়াকী ইবনুল জাররাহ (তিন খণ্ডে)

৭) আল মুসনাদ যায়েদ বিন আলী (৭৬-১২২ হিজরী)

৮) সুনান ইমাম শাফেয়ী (রহ.) (১৫০-২০৪ হিজরী)

৯) মুসনাদ ইমাম শাফেয়ী

১০) সিয়ার ইমাম আওযায়ী (৮৮-১৫৭ হিজরী)

১১) মুসনাদ আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.) (মৃত্যু ১৮১ হিজরী)

১২) মুসনাদ আবু দাউদ তায়ালেসি (মৃত্যু ২০৪ হিজরী)

১৩) আর রদ আলা সিয়ারিল আওযায়ী ইমাম আবু ইউসুফ

১৪) আল হুজ্জাহ আলা আহলিল মাদীনাহ ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান শায়বানী

১৫ কিতাবুল উম ইমাম শাফেয়ী

১৬) আল মাগাযী (চার খণ্ড) আল্লামা ওয়াকেদী (১৩০-১৮১ হিজরী)

হাদীস সংকলনের কাজ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র যুগেই শুরু হয় এবং তার যুগের পর প্রত্যেক স্তরেই ধারাবাহিকভাবে এ বিষয়ে কাজ অব্যাহত ছিল। প্রত্যেক নতুন বিজ্ঞান ও ইলমের স্বর্ণযুগের মত হাদীসের ধারাবাহিকতাও বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে বর্তমান পর্যায়ে পৌঁছেছে। কাজেই তৃতীয় শতকের পূর্বে হাদীস সংকলিত হয়নি একথা কোনভাবেই বলা যাবে না।

হাদীস যাচাইয়ের পদ্ধতি

মুহাদ্দিসগণ হাদীস যাচাইয়ের যে নীতিমালা প্রয়োগ করেছেন, তা অত্যন্ত নিঁখুত ও শক্তিশালী। শাস্ত্রের বিবেচনায় তা খুবই মজবুত। একথা অনেক অমুসলিমও স্বীকার করেছে যা হাদীস শরীফের প্রতিটি তথ্য ও প্রত্যেকটা বিবরণ পরীক্ষিত ও প্রমাণিত। সকল তথ্যের সূত্র সংরক্ষিত। হাদীস শরীফের মৌলিক গ্রন্থগুলো খুললেই দেখা যাবে যে, প্রত্যেকটি তথ্যের সঙ্গে সনদ বা হাদীসের বর্ণনাকারীদের সূত্র-পরম্পরা উল্লেখ করা হয়েছে অত্যন্ত শক্তিশালী মানদণ্ডের ভিত্তিতে।

হাদীস যাচাইয়ে মুহাদ্দিসীনদের নীতিমালা

মুহাদ্দিসীনরা হাদীসের মান যাচাইয়ের অনেক কঠোর নিয়ম-নীতি মেনে চলেছিলেন। কারণ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লামের স্পষ্ট ধমকি ছিলো তাঁর নামে মিথ্যা রচনা করার বিষয়ে। এজন্য মুহাদ্দিসীনরা এক্ষেত্রে মৌলিকভাবে দুটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। একটি রাবী সংক্রান্ত অপরটি হাদীসের মতন সংক্রান্ত।

হাদীসের রাবীর মান যাচাইয়ের নীতিমালা

হাদীসের রাবী বা বর্ণনাকারীতে নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করা। এক্ষেত্রে তারা রাবীর ব্যাপারে যেসব বিষয় জানার চেষ্টা করেছেনঃ

১) রাবী শৈশবে পেরিয়ে সবকিছু বোঝার বয়সে উত্তীর্ণ হয়েছে কিনা?

২) রাবীর মাঝে দ্বীনদারী আছে কি না?

৩) যাবতুর রাবী বা হাদীস বর্ণনাকারীর স্মৃতিশক্তি। রাবী যা শুনে তা মুখস্ত রাখতে পারে কি না?

৪) বর্ণনার ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন করে কি না?

৫) রাবী কোন স্তরের?

৬) রাবীর উস্তাদ ও শিষ্য কারা?

৭) রাবী তার কোন উস্তাদ থেকে কি পরিমাণ হাদীস বর্ণনা করেছে?

৮) হাদীসের সনদ বা সূত্র অবিচ্ছিন্ন হওয়া বা না অবিচ্ছিন্ন হওয়ার পর্যায়ভুক্ত হওয়া।

৯) হাদীসের বর্ণনা দলবিচ্ছিন্ন না হওয়া।

১০) মুকারানাতুল মারবিয়্যাত অর্থ্যাৎ, বর্ণনাটি দলবিচ্ছিন্ন কি না, বর্ণনাটির মাঝে কোনও ত্রুটি আছে কি না, আলোচিত বর্ণনাটি দুর্বল হলে তার পক্ষে কোনও মুতাবি' বা শাহিদ আছে কি না ইত্যাদি বিষয় জানার জন্য প্রত্যেক হাদীসের যত বর্ণনা পাওয়া যায় তা খুঁজে সামনে হাজির করা এবং তার আলোকে উপরোক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

১১) একই উস্তাদের শিষ্যদের বর্ণনাগুলোর মাঝে তুলনা করে সে আলোকে তাদের বর্ণনার মান নির্ণয়। তার মাঝে শ্রেণীবিন্যাস করা, যাতে তাদের হিফয ও স্মৃতিশক্তির ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় এবং বর্ণনার ক্ষেত্রে তাদের কারও ভুল হলে তা জানা যায়।

১২) আদালাতুর রাবী বা হাদীস বর্ণনাকারীর নির্ভরযোগ্যতা।

১৩) নির্ভরযোগ্যতা ও অনির্ভরযোগ্যতা বিবেচনায় রাবীদেরকে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করা এবং তার ভিত্তিতে বর্ণনাসমূহের ভিতর পার্থক্য করা।

১৪) বর্ণনার বিশুদ্ধতা বিনষ্টকারী যে-কোনও ত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়া।

এরূপ অনেক বিষয়ের আলোকে বিশেষজ্ঞদের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যেসব রাবী উত্তীর্ণ হয়েছে তাদেরকে গ্রহণ করা হয়েছে আর যেসব রাবী উত্তীর্ণ হয়নি তাদেরকে গ্রহণ করা হয়নি। শুধু তাই নয়, সকল গ্রহণীয় এবং অগ্রহণীয় রাবীদের জীবনী নিয়ে আলাদা ফন বা শাস্ত্রও তৈরি করা হয়েছে।

হাদীসের মতন বা মূলভাষ্যের মান যাচাইয়ের নীতিমালা

বর্ণনা খতিয়ে দেখা এবং বর্ণনাসমূহের মাঝে তুলনা করা। এক্ষেত্রে মুহাদ্দিসীনরা যেসব পদক্ষেপ নিয়ে থাকেনঃ

১) হাদীসের সূত্র পরম্পরা যাচাই করা। খতিয়ে দেখা যে, প্রত্যেক রাবী তার উপরের রাবী থেকে বর্ণনাটি সরাসরি গ্রহণ করেছে কিনা?

২) প্রত্যেকটি হাদীসের যত রেওয়ায়েত ও সনদ রয়েছে তা একত্রিত করা, যাতে সে হাদীসের যথাযথ বিধান নির্ণয় করা যায়।

৩) হাদীসের মান ও স্তর নির্ধারণ করা। যেমন হাদীস সহীহ না হাসান না য'ঈফ ইত্যাদি।

৪) হাদীসের মূল ভাষ্যের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া। দ্বীন ও শরীয়তে হাদীসের বক্তব্যটির মর্যাদা কি? সেটি রহিত কি না? না কি তার দ্বারা অন্য বক্তব্য রহিত হয়ে যায়। বক্তব্যের কোনও অংশ রাবীদের পক্ষ থেকে বাড়ানো কিনা? ইত্যাদি জানার চেষ্টা করা।

৫) হাদীসের বক্তব্যটি কুরআন মাজীদে আলোচিত বিষয়ের বিরোধী না হওয়া।

৬) হাদীসের বক্তব্যটি হাদীসের মধ্যে স্বীকৃত বিষয়ের বিরোধী না হওয়া।

৭) হাদীসের বক্তব্যটি ইজমা বিরোধী না হওয়া।

৮) হাদীসের বক্তব্যটি দ্বীন ও শরীয়তের স্পষ্ট ও সর্বজন স্বীকৃত বিষয়ের বিরোধী না হওয়া।

৯) হাদীসের বক্তব্যটি স্পষ্ট আকল ও বিবেক-বুদ্ধি বিরোধী না হওয়া।

১০) হাদীসের বক্তব্যটি সুস্থ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের বিরোধী না হওয়া।

১১) হাদীসের বক্তব্যটি ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত সত্যের বিরোধী না হওয়া।

১২) হাদীসের বক্তব্যটি পাতলা না হওয়া।

১৩) হাদীসের বক্তব্যটি বিধান বা আখলাক সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাধারণ মূলনীতি বিরোধী না হওয়া।

১৪) হাদীসের বক্তব্যটি চিকিৎসাবিজ্ঞানের স্পষ্ট বিষয়ের বিরোধী না হওয়া।

১৫) হাদীসের বক্তব্যটি নিম্নমানের কোনও কথা সম্বলিত না হওয়া, যা থেকে দ্বীন ও শরীয়ত অনেক দূরে।

১৬) হাদীসের বক্তব্যে কোনও কাচা কথা না আসা, যা নবীগণ তো পরের কথা, সাধারণ বুদ্ধিমানদের সঙ্গেও যায় না।

১৭) হাদীসের বক্তব্যটি বিদআতের প্রতি আহ্বানকারী রাবীর মতাদর্শকে সমর্থনকারী না হওয়া।

১৮) আমজনতার উপস্থিতিতে ঘটিত বিষয়ের হাদীসটি একজন রাবীর বর্ণনা না হওয়া।

১৯) হাদীসের বক্তব্যে সাধারণ কাজে মাত্রাতিরিক্ত সাওয়াবের বর্ণনা না থাকা।

২০) হাদীসের বক্তব্যে ছোট অপরাধের অনেক বড় শাস্তির কথা না থাকা।

মুহাদ্দিসগণ এরূপ আরও অনেক নীতিমালা প্রয়োগ করে নিশ্চিত হন হাদীসের মতন বা মূলভাষ্যের ত্রুটি যাচাইয়ের জন্য।

এগুলো ছিল হাদীসের সনদ ও মতন পর্যালোচনার ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসীনগণের নীতিমালা। তারা এসব নীতিমালা পূর্ণ আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন এবং অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তারা তা বাস্তবায়ন করেছেন।

হাদীসের মান যাচাইয়ে ফন বা শাস্ত্র প্রস্তুত করা

হাদীসে নববীকে কেন্দ্র করে একশর কাছাকাছি ফন বা শাস্ত্র তৈরি হয়েছে। কোনও কোনও শাস্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শাখা -প্রশাখাও রয়েছে অনেক। উদাহরণস্বরূপ হাদীসকে কেন্দ্র করে যেসব শাস্ত্র রচিত হয়েছে তার মধ্যে 'ইলমু আসমাইর রিজাল' বা 'হাদীস বর্ণনাকারী ব্যাক্তিদের জীবনবৃত্তান্ত' একটি গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্র। এই শাস্ত্রে উদ্দেশ্য হল বর্ণনাকারীদের মধ্যে কে নির্ভরযোগ্য আর কে নির্ভরযোগ্য না তা নির্ণয় করা। এ শাস্ত্রটির শাখা-প্রশাখা রয়েছে প্রায় বিশের মতো। যেমন কিছু কিতাব রচিত হয়েছে অঞ্চল ভিত্তিক। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি কিতাবের নাম উল্লেখ করা হল,

১) তারীখু মিসর

২) আখবারু আসবাহান

৩) মাদীনাতি দিমাশক

আবার কিছু কিতাব রচিত হয়েছে নির্ভরযোগ্য রাবীকেন্দ্রিক যেমন 'কিতাবুস সিকাত' নামে একাধিক মুহাদ্দিসের লিখা কিতাব রয়েছে। কিছু কিতাব রয়েছে অনির্ভরযোগ্য রাবী কেন্দ্রিক। যেমন 'কিতাবুয যুআফা' নামে একাধিক মুহাদ্দিসের লেখা কিতাব রয়েছে। কিছু কিতাব রয়েছে এমন যা নির্দিষ্ট কোন হাদীসের কিতাবের রাবিদেরকে নিয়ে লেখা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি কিতাবের নাম উল্লেখ করা হল,

১) রিজালু সহীহিল বুখারী

২) রিজালু সহীহি মুসলিম

অনুরূপ হাদীসের প্রসিদ্ধ ছয় কিতাব কেন্দ্রিক রচিত হয়েছে একাধিক ছোট-বড় বিভিন্ন সাইজের কিতাব। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি কিতাবের নাম উল্লেখ করা হল,

১) আল-কামাল

২) তাহযীবুল কামাল

৩) ইকমালু তাহযীবিল কামাল

৪) তাযহীবু তাহযীবিল কামাল

৫) আল-কাশিফ

৬) তাহযীবুত তাহযীব

৭) তাকরীবুত তাহযীব

৮) তাহরীরু তাকরীবিত তাহযীব

আবার শুধু এক 'তারিখু মাদীনাতি দিমাশক'-ই আশি খন্ডে মুদ্রিত হয়েছে। প্রসিদ্ধ ছয় মুহাদ্দিস কর্তৃক সংকলিত হাদীস গ্রন্থসমূহের রাবী তথা বর্ণনাকারীদের জীবন বৃত্তান্ত বিষয়ে লিখিত কিতাব 'তাহযীবুল কামাল' গ্রন্থটি টীকা সহ ছত্রিশ খণ্ডে ছেপে এসেছে।

অনুরূপ হাদীসে নববীকে কেন্দ্র করে যত কিতাব রচনা করা হয়েছে তা প্রায় চল্লিশ ধরনের। প্রত্যেকটি শাখায় রচিত কিতাবের সংখ্যা হবে শত শত বা ক্ষেত্র বিশেষে তার চেয়েও বেশি। (তাদরীবুর-রাবী, আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ.; আল-মাদখাল ইলা উলূমিল হাদীসিশ শরীফা, মাওলানা আব্দুল মালিক হাফি.)

এভাবে হাজার হাজার মুহাদ্দিস এ কাজের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। এই বিষয়ে মুসলিমগণের পাশাপাশি অমুসলিমরাও তাদের ত্যাগ ও কুরবানীর কথা, অকপটে স্বীকার করেছে। যেমন জার্মান গবেষক ও এশিয়াটিক স্যোসাইটির সাবেক সেক্রেটারি ডা. স্পেঙ্গার 'আল ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা' গ্রন্থের ইংরেজী সংস্করণের ভূমিকায় লিখেন, 'পৃথিবীতে কখনও এমন কোন জাতি ছিল না, এখনও নেই, যারা মুসলমানদের মত আসমাউর রিজাল (জীবনচারিত)-এর সুবিশাল শাস্ত্র প্রস্তুত করেছে। তিনি আরো বলেন, তারা প্রায় পাঁচ লক্ষ রাবীর জীবনচরিত প্রস্তুত করেছে এবং সংরক্ষণ করেছে।

অনুরূপ হাদীস বাহ্যিক সূত্রের বিচারে সহীহ হওয়ার পরও অনেক সময় তাতে সূক্ষ্ম ইল্লত বা ত্রুটি থাকে, যা বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ মুহাদ্দিস ছাড়া কেউ উদ্ধার করতে পারে না। সেই সূক্ষ্ম ত্রুটির কারণে অনেক সময় হাদীস দূর্বল বা অনির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত হয়। এ বিষয়েও যুগে যুগে মুহাদ্দিছগণ যে মনোযোগ ও গুরুত্ব দিয়েছেন, তাও অবাক করার মতো। এক্ষেত্রে সেসব মুহাদ্দিছগণ বেশি পারদর্শী ছিলেন যারা একটি হাদীসের বহু সূত্র সম্পর্কে জানতেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল, ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মা'ঈন, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবূ দাউদসহ সকলেরই লক্ষ লক্ষ হাদীস মুখস্ত ছিল। তাদের একটি হাদীসের বহু সূত্র মুখস্ত ছিল। ইমাম আহমেদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর মুখস্ত ছিল দশ লক্ষেরও বেশি হাদীস। ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মা'ঈন (রহ.)-এরও মুখস্থ ছিলো প্রায় দশ লক্ষ হাদীস। ইমাম বুখারী (রহ.) তো ছয় লক্ষ হাদীস মন্থন করে বুখারী শরীফ রচনা করেছেন। (তাদরীবুর-রাবী, আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ.)

তাদের জানা ও মুখস্থ থাকা লক্ষ লক্ষ হাদীসের ভিত্তিতে তারা একেকটি হাদীসের সূক্ষ্ম ইল্লত বা ত্রুটি জানতেন বা ধরতে পারতেন। তারা বিভিন্নভাবে সেসব ত্রুটিযুক্ত হাদীস স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন। বহু মুহাদ্দিস সেসব ইল্লত বা ত্রুটি নির্ণয় করার জন্য স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি প্রসিদ্ধ কিতাবের নাম উল্লেখ করা হল,

১) ইমাম আলী ইবনুল মাদানীকৃত 'কিতাবুল ইলাল'

২) ইমাম আহমেদ ইবনে হাম্বালের 'আল-ইলাল ওয়ামা'রিফাতুর রিজাল

৩) ইমাম দারাকুতনী রচিত আল-ইমাম (চৌদ্দ খণ্ডে)

মুহাদ্দিসীনদের এসকল কিতাব ও ফন শাস্ত্র প্রমাণ করে যে, সনদ ও মতন যাচাইয়ের জন্য কতোটা সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। এরপরও কেই যদি হাদীসে নববী অস্বীকার করে তবে, তা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে তাদের অজ্ঞতা বা হঠকারিতা। আর এই অপতৎপরতার কারণে অনেক সাধারণ মুসলমান তাদের ধোঁকায় নিমজ্জিত হচ্ছে।

আহলে কুরআনদের উত্থাপিত প্রধান প্রধান সংশয়গুলোর পর্যালোচনা

১) **সংশয়ঃ** আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা শুধু কুরআন মাজীদ সংরক্ষণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। যেমন তিনি বলেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

অর্থঃ নিশ্চয়ই আমি যিকির (কুরআন মাজীদ) অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই তার হেফাজত করবো। (সূরা আল-হিজরঃ ৯)

উক্ত আয়াতে কেবল কুরআন মাজীদকে হিফাজতের কথা বলা হয়েছে হাদীস সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণের কথা বলা হয়নি। অতএব হাদীস বিকৃতি ও বিনাশ থেকে নিরাপদ নয়। তাই তা হুজ্জত বা প্রমাণ হতে পারে না।

পর্যালোচনাঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস যে ওহী তা কুরআন মাজীদের অনেক আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন,

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

অর্থঃ তোমাদের সঙ্গী (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পথভ্রষ্ট হননি এবং বিপথগামীও হননি। তিনি নিজ থেকে কোনও কথা বলেন না। তা তো ওহী মাত্র, যা অবতীর্ণ করা হয়। (সূরা আন-নাজমঃ ২-৪)

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আরও বলেন,

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ ۙ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ ۚ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۖ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

অর্থঃ যখন তাদের কাছে আমার আয়াত সমূহ স্পষ্টরূপে পাঠ করা হয়, তখন যারা আমার সঙ্গে সাক্ষাতে বিশ্বাসী নয় তারা বলে, আপনি এ ছাড়া ভিন্ন কোনও কুরআন নিয়ে আসুন অথবা তা পরিবর্তন করে নিয়ে আসুন। আপনি বলুন, আমার নিজের পক্ষ থেকে তা পরিবর্তন করার সুযোগ নেই। আমি তো কেবল আমার কাছে যা ওহী হিসেবে আসে তারই অনুসরণ করি। আমি যদি আমার রবের অবাধ্য হই তবে আমি মহা দিবসের শাস্তিকে ভয় করি। (সূরা ইউনুসঃ ১৫)

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আরও বলেন,

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ

অর্থঃ যদি সে (রাসূল) আমার ব্যাপারে কোনও কথা বানিয়ে আমার নামে আরোপ করত, তবে তার ডান হাত ধরে ফেলতাম। তারপর তার জীবন-ধমনী কেটে দিতাম। (সূরা আল-হাক্কাহঃ ৪৪-৪৬)

এসব আয়াত দ্বারা একথা স্পষ্ট হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেন সবই ওহীর অন্তর্ভুক্ত। তিনি আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার নামে মনগড়া কিছু বলতে পারেন না। যা কিছু বলেন, আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার পক্ষ থেকে নির্দেশনার আলোকেই বলে থাকেন। অতএব কুরআন মাজীদ যেমন ওহী, হাদীস ও সুন্নাহও তেমন ওহী। আর উভয় প্রকার ওহীকেই আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

২) **সংশয়ঃ** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের অনুসরণ করলে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার সঙ্গে তাকে শরীক করা অপরিহার্য হয়ে যায়। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন,

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ ۚ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ يَقُصُّ الْحَقَّ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

অর্থঃ আপনি বলে দিন, নিশ্চয়ই আমার নিকট রয়েছে আমার রবের পক্ষ থেকে সাক্ষ্য প্রমাণ। অথচ তোমরা কি সে জিনিস অস্বীকার করছ, যা তোমরা সত্বর চাচ্ছ, তা আমার নিকট নেই। হুকুম একমাত্র আল্লাহর। তিনি সত্য বর্ণনা করেন এবং তিনি সর্বোত্তম ফয়সালাকারী। (সূরা আল-আন'আমঃ ৫৭)

পর্যালোচনাঃ

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তো যুগে যুগে নবী ও রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন শিরক নির্মূল করার জন্য। নবীর হুকুম তো আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার হুকুমেরই বাস্তবায়ন। তাইতো নবীর হুকুম না মানলে সে মু'মিনীন নয় বলে কুরআন ঘোষণা দিয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

অর্থঃ অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম! সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে ন্যায়বিচারক বানাবে। অতঃপর আপনার মীমাংসার ব্যাপারে নিজেদের মনে কোনও সংকীর্ণতা বোধ করবে না এবং তা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিবে। (সূরা আন-নিসাঃ ৬৫)

এছাড়া এ সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ আমরা পূর্বোক্ত অধ্যায়ে আলোচনা করেছি, যেখানে দেখিয়েছি যে, দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার পক্ষ থেকে প্রতিদান পেতে হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য ও ইত্তেবা বা অনুসরণ করতে হবে। তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করা যাবে না। যারা বিরুদ্ধাচরণ করবে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। যেখানে স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য ও অনুসরণ করার কথা বলেছে এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে নিষেধ করেছেন, সেখানে আল্লাহর সাথে শরীক করার কোন প্রশ্নই আসতে পারে না।

৩) **সংশয়ঃ** আবদুল্লাহ চকরালভী ও গোলাম আহমাদ পারভেজ সহ অনেকের বক্তব্য হল হাদীস ও সুন্নাহ ওহী নয়। হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযী (রহ.)-এর যুগের পূর্বে মানুষ এ সম্পর্কে জানতোই না। এ তো কেবল কিছু কথাবার্তা যা পরবর্তীতে মানুষ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে চালিয়ে দিয়েছে। ওহী হিসেবে তো তার উপর কেবল কুরআন মাজীদ নাযিল হয়েছে।

আরও সংশয়ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন মাজীদের মতো হাদীস সংরক্ষণের কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। বরং তা লিখতে নিষেধ করেছেন। অনুরূপ সাহাবায়ে কিরামও তা সংরক্ষণের কোনও ব্যবস্থা করেন নি।

পর্যালোচনাঃ

আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগেই হাদীস লিখার, কিতাবে লিপিবদ্ধ করার এবং মুখস্ত করার প্রচলন ছিল। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-দের দিয়ে একাধিক কিতাব লিখিয়েছিলেন বিভিন্ন গভর্ণরদের জন্য এবং বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিদের জন্য। পরবর্তীতে

সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-ও এসব হাদীসের আলোচনা করেন। পরবর্তীতে সাহাবায়ে কিরাম (রা.) তাদের শিষ্যদের শিক্ষা দান করেন এবং সংরক্ষিত হাদীসের নকলও তৈরী করেন। হাদীস সংরক্ষণের ধারাবাহিকতা তাবি'ঈনদের যুগেও ছিলো। পরবর্তীতে এসকল কিতাব হিজরী তৃতীয় শতকে খলীফা হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.)-এর যুগে বৃহৎ কিতাবের মধ্যে সংকলিত হয়ে যায়, যার পূর্ণ বিস্তারিত আলোচনা আমরা পূর্বেই করেছি।

যদিও একটি হাদীস আছে যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস লিখার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিলেন। হাদীসটি মুসলিম শরীফের বর্ণনায় পাওয়া যায়,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا تَكْتُبُوا عَنِّي، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ، وَحَدِّثُوا عَنِّي وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ – قَالَ هَمَّامٌ: أَحْسِبُهُ – قَالَ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

অর্থঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা আমার কোনও কথা লিখো না। আর যে কুরআন ছাড়া আমার কোনও কথা লিখেছে সে যান তা মুছে ফেলে। আর তোমরা আমার থেকে বর্ণনা করো, এতে কোন সমস্যা নেই। যে ব্যক্তি আমার নামে ইচ্ছাকৃত কোনও কথা বানিয়ে বলবে, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ৩০০৪)

যখন এমন হাদীস পাওয়া যায় যেখানে হাদীসের বৈপরীত্য দেখা যায়, মুহাদ্দিসীনরা সে হাদীস সমূহের বিশ্লেষণের জন্য কিছু নীতিমালা গ্রহণ করে থাকেন। এই ক্ষেত্রে হাদীসের তাৎপর্য বিশ্লেষণে চারটি সম্ভাব্যতা তুলে ধরা হল,

ক) যে ব্যক্তি লিখে না রাখলে ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লিখে রাখার অনুমতি দিয়েছেন। আর যার ব্যাপারে উক্ত আশংকা ছিল না সে যাতে লেখার উপর নির্ভরশীল না হয়ে যায়, সেজন্য তাকে লিখতে বারণ করেছেন।

খ) বিশেষ কয়েকজন সাহাবীকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস লিখতে নিষেধ করেছেন, যারা কুরআন মাজীদ ও হাদীস উভয়ই একই জায়গায় লিখে রাখতেন। যেহেতু কুরআন মাজীদ ও হাদীস একসঙ্গে মিশে যাওয়ার আশংকা ছিল তাই তাদেরকে হাদীস লিখতে নিষেধ করেছেন।

গ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু কাতিবে ওহীদের হাদীস লিখিত নিষেধ করেছেন, যেহেতু কুরআনের সাথে হাদীস মিশে যাবার আশংকা ছিল। আর অন্যদেরকে লিখতে বাঁধা দেননি, কারণ এরকম কোনও আশংকা ছিল না।

ঘ) একটা সময় পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা বিদ্যমান ছিল, যখন কুরআন মাজীদের সঙ্গে হাদীস মিলে যাওয়ার আশংকা ছিল। পরে সেই নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে, যখন সেই আশংকা আর বাকি থাকেনি।

এই চারটি ব্যাখ্যার মধ্যে হাদীস ব্যাখ্যাতাগণ ব্যাপকভাবে চতুর্থ ব্যাখ্যাকেই গ্রহণ করেছেন। অতএব হাদীস লিখার নিষেধাজ্ঞা একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বা ব্যক্তি বিশেষের সাথে সীমাবদ্ধ ছিল।

৪) **সংশয়ঃ** কুরআন মাজীদেই সব কিছুর বর্ণনা রয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তাঁর কিতাবে কোন আলোচনাই ছাড়েননি। দ্বীন ও শরীয়তের সকল খুঁটিনাটি বিষয় তিনি কুরআন মাজীদে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। অতএব কুরআন মাজীদ থাকতে হাদীস ও সুন্নাহর কোনও প্রয়োজন নেই।

পর্যালোচনাঃ

আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কুরআন মাজীদেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাকে ওহী হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন এবং বলেছেন কুরআন মাজীদের ব্যাখ্যা ওহী গায়রে মাতলু

হিসেবে হাদীসে নববীর মাধ্যমে নাযিল করেছেন। এছাড়াও নামায আদায়ের পদ্ধতি, নামাযের সংখ্যা সংক্রান্ত আলোচনা থেকে দেখেছি যে, কুরআন মাজীদের পরিপূর্ন ব্যাখ্যার জন্য ওহী গারে মাতলু তথা হাদীসে নববীর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

৫) **সংশয়ঃ** হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণয়ের জন্য মুহাদ্দিসগণ যে নীতিমালা প্রয়োগ করেছেন তা শক্তিশালী নয় বরং তা অবৈজ্ঞানিক ও অবাস্তব।

আরও সংশয়ঃ মুহাদ্দিসীনরা শুধু হাদীসের সনদ বা সূত্র পর্যালোচনা করেছেন হাদীসের মূলভাষ্য ও বক্তব্যের বিষয়ে তারা গুরুত্ব দেননি। এই বিষয়ে তাদের তেমন মনোযোগ লক্ষ্য করা যায় না।

আরও সংশয়ঃ মওযূ' ও জাল হাদীস এমন ভাবে সহীহ হাদীসের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে গেছে যে তা আলাদা করা অসম্ভব।

পর্যালোচনাঃ

কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্পর্কে জানে এমন সবাই নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছে যে মুহাদ্দিসগণ হাদীস যাচাই-বাছাইয়ের যে নীতিমালা প্রয়োগ করেছেন তা অত্যন্ত নিখুত ও শক্তিশালী। শাস্ত্রের বিবেচনায় তা খুবই মজবুত। একথা অনেক অমুসলিমও অকপটে স্বীকার করেছে যে, হাদীস শরীফের প্রত্যেকটি বিবরণ পরীক্ষিত ও প্রমাণিত। সকল তথ্যের সূত্র সংরক্ষিত। হাদীসের মৌলিক গ্রন্থগুলো খুললেই দেখা যাবে যে, প্রত্যেকটি তথ্যের সঙ্গে সনদ বা হাদীসের বর্ণনাকারীদের সূত্র পরম্পরা উল্লেখ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, অত্যন্ত শক্তিশালী মানদণ্ডের ভিত্তিতে তার পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করা হয়েছে।

আমরা পূর্বেই এ ব্যাপারে আলোচনা করেছি যে, মুহাদ্দিসীনরা হাদীসের মান যাচাই করার জন্য বেশ কঠোর নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন। এই নীতিমালা উভয়দিকের জন্যই ছিলো, রাবীদের মান যাচাই এবং একই সাথে হাদীসের মূল বক্তব্য তথা মতনের মান যাচাই। এমনকি প্রত্যেক রাবীদের জীবনচরিত সংক্রান্ত ফন বা শাস্ত্রও প্রণয়ন করেছেন। যার বিস্তারিত আলোচনা পূর্বের আধ্যয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

৬) **সংশয়ঃ** হযরত আবু হুরায়রা (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওফাতের মাত্র কয়েক বছর পূর্বে মুসলমান হয়েও সব সাহাবীদের থেকে কীভাবে বেশি হাদীস বর্ণনা করেছেন? হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে প্রিয় ও ঘনিষ্ঠ সাহাবী ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) তো সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন, আর হযরত উমর (রা.)-ও শুরুরদিকে হিজরতের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এত দীর্ঘ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংস্পর্শে থাকার পরেও হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর সমপরিমাণ তো দূরের কথা, তার কাছাকাছি পরিমাণ হাদীসও তারা বর্ণনা করেননি। অতএব হযরত আবু হুরায়রা (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে হয় নিজেই মিথ্যা হাদীস রচনা করেছেন বা অন্য কেউ মিথ্যা হাদীস রচনা করে তার নামে চালিয়ে দিয়েছে।

পর্যালোচনাঃ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর জীবদ্দশায় এরকম প্রশ্ন উঠেছিল, তখন তিনি নিজেই এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। ইমাম বুখারী (রহ.) তা সহীহ বুখারীতে উল্লেখ করেছেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন,

يَقُولُونَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ، وَاللهُ الْمَوْعِدُ، وَيَقُولُونَ: مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ لَا يُحَدِّثُونَ مِثْلَ أَحَادِيثِهِ؟ وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ، وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ، وَكُنْتُ امْرَأً مِسْكِينًا، أَلْزَمُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مِلْءِ بَطْنِي، فَأَحْضُرُ حِينَ يَغِيبُونَ، وَأَعِي حِينَ يَنْسَوْنَ، وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا: "لَنْ يَبْسُطَ أَحَدٌ مِنْكُمْ ثَوْبَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي هَذِهِ، ثُمَّ يَجْمَعَهُ إِلَى صَدْرِهِ فَيَنْسَى مِنْ مَقَالَتِي شَيْئًا أَبَدًا". فَبَسَطْتُ نَمِرَةً لَيْسَ عَلَيَّ ثَوْبٌ غَيْرَهَا، حَتَّى قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَقَالَتَهُ، ثُمَّ جَمَعْتُهَا إِلَى صَدْرِي، فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ، مَا نَسِيتُ مِنْ مَقَالَتِهِ تِلْكَ إِلَى يَوْمِي هَذَا، وَاللهِ لَوْلَا آيَتَانِ فِي كِتَابِ اللهِ، مَا حَدَّثْتُكُمْ شَيْئًا أَبَدًا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿الرَّحِيمُ﴾

অর্থঃ লোকজন বলেছে আবু হুরায়রা অনেক হাদীস বর্ণনা করে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার কাছে তো হাজির হতে হবে। তারা বলে থাকে, অন্যান্য মুহাজির ও আনসাররা তো তার মত এত হাদীস বর্ণনা করেনা। আমার মুহাজির ভাইয়েরা তো তাদের বাজারের ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকে, আর আনসাররা তো তাদের সম্পদ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। আমি তো ছিলাম নিঃস্ব, পেটে ভাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে পড়ে থাকতাম। তাই তারা যে বিষয় থেকে অনুপস্থিত, আমি তাতে হাজির। তারা যা ভুলে যায়, আমি তা মুখস্ত রাখি। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি তার চাদর বিছাবে আর আমি ইরশাদ করব, অতঃপর সে তা তার বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরবে, তাহলে সে কখনও ভুলবে না। তাই আমি আমার চাদরটি বিছিয়ে দিলাম। আমার গায়ে এছাড়া ভিন্ন কোনও পোশাক ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাণী ইরশাদ করলেন। আমি আমার চাদর বুকে জড়িয়ে ধরলাম। এরপর আমি তাঁর সেই কথা আজও ভুলিনি। যদি কুরআনে দুটি আয়াত না থাকত, তবে আমি কখনওই তোমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করতাম না। আয়াত দুটি হল,

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۙ أُولَـٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ — إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَـٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

অর্থঃ যারা আমার নাযিলকৃত স্পষ্ট বিধানাবলি ও পথনির্দেশক বিষয়াদি গোপন করে, আমি মানুষের জন্য কিতাবে তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেওয়ার পরও, তাদেরকে আল্লাহ লা'নত করেন এবং তাদের লা'নত করে অন্যান্য লা'নতকারীও। তবে যারা তওবা করে, (নিজেদের) সংশোধন করে এবং (সত্য বিষয়) প্রকাশ করে দেয়, আমি তাদের তওবা কবুল করি। আর আমিই অত্যাধিক তওবা কবুলকারী, অতি মেহেরবান। (সূরা আল-বাকারাঃ ১৫৯-১৬০; সহীহ বুখারী, হাদীস ২৩৫০)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) যখন এ কথা বলেন, তখন বহু সাহাবী জীবিত ছিলেন। কেউ তার এ কথার বিরোধিতা করেননি। বরং তারা তার এ কথা মেনে নিয়েছেন ও সত্যায়ন করেছেন। যেমন এ বিষয়ে তিরমিযী শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর কথা এভাবে এসেছে যে,

يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، أَنْتَ كُنْتَ أَلْزَمَنَا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحْفَظَنَا لِحَدِيثِهِ.

অর্থঃ হে আবু হুরায়রা! আপনি তো আমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে বেশি সংস্পর্শে রয়েছেন ও সবচেয়ে বেশি হাদীসের অধিকারী। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস ৩৮৩৬)

এভাবে সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংস্পর্শে থাকা ও তাঁর পক্ষ থেকে বিশেষ দোয়া লাভ করাই তাকে অধিক পরিমাণ হাদীস মুখস্ত করা ও তা বর্ণনায় এগিয়ে দিয়েছে। আবার তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর ৪৮ বছর বেঁচে ছিলেন। এ কারণে তিনি হাদীস বর্ণনার সুযোগও বেশি পেয়েছেন। অপরদিকে হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.) কর্তৃক কম হাদীস বর্ণনার কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে,

ক) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তারা প্রচুর হাদীস শোনার সুযোগ পেয়েছেন, কিন্তু তাঁর ওফাতের পর তারা বেশীদিন বেঁচে থাকেননি।

খ) তারা খলিফা হওয়ার কারণে রাষ্ট্রীয় কাজে বেশি ব্যস্ত ছিলেন। তাই হাদীস বর্ণনার কাজে হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-সহ অন্য অনেকের মত ব্যস্ত হতে পারেননি।

গ) তাদের অনেকে খুব বেশি সতর্কতা অবলম্বন করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করবে, সে যেন জাহান্নামকে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়। যদিও সতর্কতার সঙ্গে হাদীস বর্ণনা করলে এ সাবধানবাণীর অধীনে পড়বে না, তারপরও হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে কোথায়ও যদি ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যায়, তবে তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ সাবধানবাণীর অধীনে পড়ে যাওয়ার আশংকা থাকে।

এসব বিশ্লেষণ থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) যে পরিমাণ হাদীস বর্ণনা করেছেন তা অন্যান্য অনেক সাহাবীর তুলনায় বেশি হলেও একেবারে অবাস্তব নয়।

৭) **সংশয়ঃ** ওহীর যে দুই প্রকার ভাগ করা হয় অর্থাৎ ওহী মতলু ও ওহী গায়রে মাতলু, এই বিভাজন ইহুদীদের কাছ থেকে ধার নেয়া।

পর্যালোচনাঃ

আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কুরআন মাজীদেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাকে ওহী হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন এবং সেখান থেকে আমরা আরও দেখেছিলাম যে, কুরআন মাজীদের ব্যাখ্যা হাদীসে নববীর মাধ্যমে নাযিল করেছেন। এছাড়াও নামায আদায়ের পদ্ধতি, নামাযের সংখ্যা সংক্রান্ত আলোচনা থেকে দেখেছি যে, কুরআন মাজীদের পরিপূর্ন ব্যাখ্যার জন্য ওহী গারে মাতলু তথা হাদীসে নববী ব্যাতীত জানা সম্ভব নয়। সুতরাং এটি একটি বানোয়াট কথা।

হাদীস অস্বীকারকারীদের অবস্থা

বিভ্রান্তির শিকার

আমরা উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়েছি যে, কুরআনুল কারীমের পর হাদীসে নববী দ্বীন ও শরীয়তের হুজ্জত ও প্রমাণ। কিন্তু এতসব দলীল-প্রমাণ থাকার পরও এক শ্রেণীর লোক তার হুজ্জিয়াত বা প্রামাণিকতাকে অস্বীকার করেছে। হাদীসে নববীর প্রামাণিকতা অস্বীকার করার ফলে তারা দ্বীন ও ইসলামের নানা বিষয়ে বিভ্রান্তিমূলক কথাবার্তা বলেছে এবং সেসব আমূলক কথাবার্তা নানাভাবে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছে। কখনও সেসব কথা বই আকারে ছাপিয়ে প্রচার করার চেষ্টা করেছে। আবার কখনও সেসব কথা মিডিয়ার মাধ্যমে ছড়ানোর চেষ্টা করেছে। অনলাইন ও অফলাইনে প্রচার করেছে। এভাবে নিজেরা তো বিভ্রান্ত হয়েছে, সঙ্গে বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে।

হাদীসে নববীর হুজ্জিয়াত বা প্রমাণিকতাকে অস্বীকার করার কারণে তারা যে ধরণের বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে তা নিচে তুলে ধরা হল,

১) কখনও তারা কুরআনুল কারীমের আয়াতের বিকৃতি সাধন করেছে।

২) কখনও মুতাওয়াতির বা অসংখ্য সুত্রে বর্ণিত অকাট্য বিষয় অস্বীকার করেছে।

৩) কখনও দ্বীন ও শরীয়তের সর্বসম্মত বিষয় অস্বীকার করেছে।

৪) কখনও প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক তথ্য অস্বীকার করেছে।

৫) কখনও যুগ যুগ ধরে চলে আসা উলামায়ে কিরামের নিকট স্বীকৃত ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করেছে।

হাদীস অস্বীকারের শেষ পরিণাম কুরআন অস্বীকার

কুরআন মাজীদ আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সেই পবিত্র কিতাব, যা মানবজাতির হিদায়াতের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে। কুরআন মাজীদ মানুষকে জীবনের নানা বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেছে। কিন্তু কুরআন মাজীদের সে নির্দেশনাগুলো নানা জায়গায় অবিস্তারিতরূপে এসেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার নির্দেশ হল তিনি যাতে সেগুলোকে বিস্তারিত বর্ণনা করে দেন। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই বিস্তারিত বর্ণনাসহই কুরআন মাজীদকে সঠিকভাবে বোঝা সম্ভব। যদি কেউ হাদীস ও সুন্নাহর বিস্তারিত বিবরণ বা বিশ্লেষণ ছাড়া কুরআন মাজীদ বুঝতে যায়, তবে সে বহু আয়াতের এমন এমন অর্থ করবে বা সেসব আয়াতের এমন ব্যাখ্যা পেশ করবে যে, প্রকারান্তরে সেই ওইসব বিষয়কেই অস্বীকার করে বসবে। এভাবে শেষ পর্যন্ত কুরআন মাজীদকে অস্বীকার করে বসবে। (নুসরাতুল হাদীস, মুহাদ্দিসে কাবীর, হাবীবুর রহমান আ'যমী, পৃষ্ঠাঃ ৯১-৯৪)

উলামায়ে কিরামের অবস্থান

দ্বীন ও শরীয়তের অকাট্য দলীলসমূহ দ্বারা এ কথা প্রমাণিত যে, হাদীসে নববী ইসলামের এক শক্তিশালী হুজ্জত ও দলীল। কুরআন মাজীদের পরই এর অবস্থান। এ কথা বিশ্বাস করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য জরুরী এবং এটা ইসলামী আক্বীদার অপরিহার্য অংশ। অতএব কোনও মুসলিম তা অস্বীকার করতে পারেনা। কেউ যদি এই অকাট্য আক্বীদা অস্বীকার করে তবে সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে। এ কথা যুগে যুগে উলামায়ে কিরাম তাদের বয়ান ও লিখনিতে তুলে ধরেছেন। নিচে কতিপয় আলেমের এই বিষয়ক ফাতওয়া তুলে ধরা হলোঃ

১) ইমাম হাযম যাহিরী (রহ.) সুন্নাহর প্রামাণিকতার গুরুত্ব তুলে ধরতে গিয়ে বলেন,

فلم يسع مسلماً يقر بالتوحيد، أن يرجع عند التنازع إلى غير القرآن، والخبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن يأبى عما وجد فيهما، فإن فعل ذلك بعد قيام الحجة عليه فهو فاسق، وأما من فعله مستحلاً للخروج عن أمرهما، وموجباً لطاعة أحد دونهما، فهو كافر.

অর্থঃ তাওহীদে বিশ্বাসী কোনও মুসলিমের জন্য এই সুযোগ নেই যে, সে মতবিরোধের সময় কুরআন ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস ছেড়ে অন্য কোনও দিকে যাবে। তার জন্য এ সুযোগও নেই যে, তাতে উল্লিখিত কোনও বিষয়কে অস্বীকার করবে। প্রমাণ সম্পর্কে জানার পরও সে যদি তা করে, তবে সে ফাসেক। আর যে কুরআন ও সুন্নাহর আদেশের বাইরে যাওয়াকে বৈধ মনে করে বা এতদ্ভিন্ন অন্য কিছু অনুসরণকে জায়েয মনে করে তবে সে কাফের। (আল-ইহকাম ফী উসূলিল আহকাম, ১/৯৯)

এখানে ইবনে হাযম যহিরী (রহ.) কুরআন মাজীদের সঙ্গে হাদীস মান্য করা বা অনুসরণ করাকে কুরআন মাজীদের মতোই অপরিহার্য সাব্যস্ত করেছেন। সুতরাং কুরআন মাজীদের বিধান অমান্য করাকে বৈধ মনে করলে যেমন সে কাফের হয়ে যাবে, তেমনি হাদীস বা সুন্নাহর বিধান অমান্য করাকে বৈধ মনে করলেও কাফের হয়ে যাবে।

২) হাফিজ ইবনে আবদুল বার্র (রহ.) কুরআন ও সুন্নাহর প্রামাণিকতা অস্বীকারকারীকে কাফের আখ্যা দিয়ে বলেন,

وَأَمَّا أُصُولُ الْعِلْمِ فَالْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، وَتَنْقَسِمُ السُّنَّةُ قِسْمَيْنِ أَحَدُهُمَا تَنْقُلُهُ الْكَافَّةُ عَنِ الْكَافَّةِ فَهَذَا مِنَ الْحُجَجِ الْقَاطِعَةِ لِلْأَعْذَارِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ هُنَالِكَ خِلَافٌ وَمَنْ رَدَّ إِجْمَاعَهُمْ فَقَدْ رَدَّ نَصًّا مِنْ نُصُوصِ اللَّهِ يَجِبُ اسْتِتَابَتُهُ عَلَيْهِ وَإِرَاقَةُ دَمِهِ إِنْ لَمْ يَتُبْ؛ لِخُرُوجِهِ عَمَّا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ الْعُدُولُ وَسُلُوكِهِ غَيْرَ سَبِيلِ جَمِيعِهِمْ.

অর্থঃ ইলমের দলীল হল কুরআন ও সুন্নাহ। সুন্নাহ দুই প্রকার। এক. সর্বসম্মত বিষয়, যা বহু মানুষ থেকে বহু মানুষ বর্ণনা করে থাকে। এটা তো অকাট্য দলীল। কেননা এ ব্যাপারে কোনও ইকতিলাফ পাওয়া যায় না। যে ব্যক্তি তাদের সর্বসম্মত বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করবে, সে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার পক্ষ থেকে বর্ণিত স্পষ্ট বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করল। তাকে তওবা করানোর জরুরী। যদি তওবা না করে তবে তার রক্ত হালাল। কারণ সে মুসলিমদের সর্বসম্মত বিষয় থেকে বের হয়ে গিয়েছে এবং তাদের পথ বাদ দিয়ে ভিন্ন পথ ধরেছে।

ইবনে আব্দুল বার্র (রহ.) এখানে ব্যক্তিকে সুন্নাহর প্রমাণিকতা অস্বীকার করার ফলে কাফের আখ্যা দিয়েছেন। (জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী, ইবনে আব্দুল বার্র, পৃষ্ঠাঃ ১/৭৭৮)

৩) হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেন,

والكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة، باتفاق السلف. وما أخبر به الرسول عن الله، فهو في وجوب تصديقه والإيمان به كما أَخبرَ به الربُّ تعالى على لسان رسوله. هذا أصلٌ متفق عليه بين أهل الإسلام، لا ينكره إلا من ليس منهم.

অর্থঃ 'কিতাব' দ্বারা উদ্দেশ্য হল, কুরআন আর 'হিকমাহ' দ্বারা সালাফের সকলের মতেই সুন্নাহ উদ্দেশ্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার পক্ষ থেকে যে সংবাদ প্রদান করেন তা বিশ্বাস করা ও তাঁর প্রতি ঈমান আনা, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের জবানিতে সংবাদ প্রদান করেন তার পর্যায়ভুক্ত। এটা মুসলিম উম্মাহর সর্ববাদিসম্মত নীতি। মুসলিম নয়, এমন ব্যক্তিই তা অস্বীকার করতে পারে। (কিতাবুর-রূহ, পৃষ্ঠাঃ ১০৫)

এখানে হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) হাদীস ও সুন্নাহকে হুজ্জত বা দলীল হিসেবে গ্রহণ করতে অপ্রস্তুত ব্যক্তিকে অমুসলিম আখ্যা দিয়েছেন।

৪) আল্লামা শাওকানী (রহ.) বলেন,

أَنَّ ثُبُوتَ حُجِّيَّةِ السُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ وَاسْتِقْلَالَهَا بِتَشْرِيعِ الْأَحْكَامِ ضَرُورَةٌ دِينِيَّةٌ وَلَا يُخَالِفُ فِي ذَلِكَ إِلَّا مَنْ لَا حَظَّ لَهُ في دين الإسلام.

অর্থঃ নিশ্চয়ই হাদীস ও সুন্নাহ দ্বীন ও শরীয়তের স্বতন্ত্র হুজ্জত বা দলীল, একথা দ্বীনের স্বতঃসিদ্ধ আক্বীদা। দ্বীন ইসলামে যার কোনও হিসসা নেই, সেই তা অস্বীকার করতে পারে। (অর্থাৎ কোনও মুসলিম হাদীস ও সুন্নাহর হুজ্জিয়াত বা প্রামাণিকতাকে অস্বীকার করতে পারে না)। (ইরশাদুল ফুহুল, ১/৯৭)

৫) মাওলানা শামসুল হক আযীমাবাদী (রহ.) হাদীস অস্বীকারের ফিতনা সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী সম্বলিত এক হাদীসের ব্যাখ্যায় লেখেন,

وَلَقَدْ ظَهَرَتْ مُعْجِزَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَقَعَ بِمَا أَخْبَرَ بِهِ فَإِنَّ رَجُلًا خَرَجَ مِنَ الْفِنْجَابِ مِنْ إِقْلِيمِ الْهِنْدِ وَانْتَسَبَ نَفْسَهُ بِأَهْلِ الْقُرْآنِ وَشَتَّانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِ الْقُرْآنِ بَلْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْإِلْحَادِ وَالْمُرْتَدِّينَ وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ فَأَضَلَّهُ الشَّيْطَانُ وَأَغْوَاهُ وَأَبْعَدَهُ عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ فَتَفَوَّهَ بِمَا لَا يَتَكَلَّمُ بِهِ أَهْلُ الْإِسْلَامِ فَأَطَالَ لِسَانَهُ فِي إِهَانَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَدَّ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ بِأَسْرِهَا وَقَالَ هَذِهِ كُلُّهَا مَكْذُوبَةٌ وَمُفْتَرَيَاتٌ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَإِنَّمَا يَجِبُ الْعَمَلُ عَلَى الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ فَقَطْ دُونَ أَحَادِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَانَتْ صَحِيحَةً مُتَوَاتِرَةً وَمَنْ عَمِلَ عَلَى غَيْرِ الْقُرْآنِ فَهُوَ دَاخِلٌ تَحْتَ قَوْلِهِ تَعَالَى وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هم الكافرون وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ أَقْوَالِهِ الْكُفْرِيَّةِ وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ كَثِيرٌ مِنَ الْجُهَّالِ وَجَعَلَهُ إِمَامًا وَقَدْ أَفْتَى عُلَمَاءُ الْعَصْرِ بِكُفْرِهِ وَإِلْحَادِهِ وَخُرُوجِهِ عَنْ دَائِرَةِ الْإِسْلَامِ وَالْأَمْرِ كَمَا قَالُوا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

অর্থঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে তাঁর মুজিযার প্রকাশ ঘটেছে। কেননা ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশে এক ব্যক্তি আত্মপ্রকাশ করেছে। সে নিজেকে 'আহলে কুরআন' বলে দাবি করেছে। প্রকৃত কুরআনের অধিকারীদের সঙ্গে তার যোজন যোজন দূরত্ব রয়েছে। সে তো বরং মূলহিদ মুরতাদদের অন্তর্ভুক্ত। ... তার ব্যাপারে যুগের উলামায়ে কিরামের ফাতওয়া হল, সে কাফের, মুলহিদ এবং ইসলামের গণ্ডি থেকে বহির্ভূত। (আউনুল, মা'বুদ, শামসুল হক আযীমাবাদী, ১২/২৩৩)

৬) শায়খ আব্দুল গনী আব্দুল খালিক (রহ.) বলেন,

وليت شعرى، كيف يتصور: أن يكون نزاع فى هذه المسألة بين المسلمين، وأن يأتى رجل: فى رأسه عقل، ويقول: أنا مسلم، ثم ينازع فى حجية السنة بجملتها؟ مع أن ذلك مما يترتب عليه عدم اعترافه بالدين الإسلامى كله من أولة إلى آخره. فإن أساس هذا الدين هو الكتاب، ولا يمكن القول بأنه كلام الله مع إنكار حجية السنة جملة، فإن كونه كلام الله، لم يثبت إلا بقول الرسول (الذى ثبت صدقه بالمعجزة) "إن هذا كلام الله وكتابه" وقول الرسول هذا

من السنة التى يزعم: أنها ليست بحجة. فهل هذا إلا إلحاد وزندقة، وإنكار للضرورى من الدين: يقصد به تقويض الدين من أساسه.

অর্থঃ একজন ব্যক্তি মুসলিম হয়ে কিভাবে হাদীস ও সুন্নাহর হুজ্জিয়াত বা প্রামাণিকতা অস্বীকার করতে পারে? যে সুন্নাহকে অস্বীকার করে, সে গোটা দ্বীনকে অস্বীকার করে। কারণ এই দ্বীনের প্রধান ভিত্তি হল কুরআন মাজীদ। হাদীসকে অস্বীকার করে কুরআনকে আল্লাহ কালাম হিসেবে মানা সম্ভবই নয়। কেননা কুরআন যে আল্লাহর কালাম সেটাও তো সেই রাসূলের কথা দ্বারাই প্রমাণিত হয়েছে। বিভিন্ন মুজিযা দ্বারাও এর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। রাসূলের এ বক্তব্যও সুন্নাহরই অংশ। সে তো এই সুন্নাহকে হুজ্জত বা দলীল মনে করে না। এটা নাস্তিকতা ও দ্বীনকে অস্বীকার করার নামান্তর। (হুজ্জিয়াতুস-সুন্নাহ, শায়খ আব্দুল গনী আব্দুল খালিক, পৃষ্ঠাঃ ২৪৯-২৫০)

৭) মুহাদ্দিসে কাবীর হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান আযমী (রহ.) বলেন, 'রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস ও সুন্নাহ অস্বীকারের মূল চেতনা সৃষ্টি হয় ধর্মহীনতা ও মুক্তচিন্তা থেকে। কিন্তু এই ধর্মহীন চিন্তা ঢাকার জন্য নিজেদেরকে হাদীস অস্বীকারকারী বলে তার উপর পর্দা দেওয়া হয়।' (নুসরাতুল হাদীস, মুহাদ্দিসে কাবীর, হাবীবুর রহমান আ'যমী, পৃষ্ঠাঃ ২৫)

তিনি আরও বলেন, 'হাদীস অস্বীকারের শেষ ফল হল কুরআন অস্বীকার।' (নুসরাতুল হাদীস, মুহাদ্দিসে কাবীর, হাবীবুর রহমান আ'যমী, পৃষ্ঠাঃ ৯১)

৮) মূফতি তাক্বী উসমানী (হাফি.) হাদীস ও সুন্নাহর হুজ্জিয়াত ও প্রমাণিকতা সম্পর্কে বলেন, 'ফিক্বহী মতামত নিয়ে মুসলিমদের মাঝে ইখতিলাফ থাকলেও হাদীসের হুজ্জিয়াত ও প্রমাণিকতাকে কোনও আইন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিও অস্বীকার করেনি। শুধু ওই ব্যক্তির কথা ভিন্ন, যে নিজেকে মুসলিম সমাজ থেকে আলাদা করে নিয়েছে। (হুজ্জিয়াতে হাদীস, মূফতি তাক্বী উসমানী, পৃষ্ঠাঃ ৭)

এখানে মূফতি তাক্বী উসমানী (হাফি.) বলতে চেয়েছেন যে, কোনও মুসলিম হাদীস ও সুন্নাহর হুজ্জিয়াত বা প্রামাণিকতা অস্বীকার করতে পারে না। আর যে হাদীস ও সুন্নাহর হুজ্জিয়াতকে অস্বীকার করবে, সে মুসলিম থাকতে পারে না।

৯) সৌদি আরবের বিখ্যাত শায়খ বিন বায (রহ.) 'আহলে কুরআন' সম্পর্কে জিজ্ঞাসার জবাবে বলেন,

ليسوا قرآنيين، ولكنَّهم كذَّابون، أعداء للقرآن؛ لأنَّ القرآن أمر بالسنة، وأمر بطاعة الرسول صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ومَن أنكر السنة فقد أنكر القرآن، ومَن عصى الرسول فقد عصى القرآن، فليسوا قرآنيين، ولكنَّهم ضد القرآن، وملاحدة، وضالُّون، بل كفَّار بإجماع أهل العلم.

অর্থঃ তারা প্রকৃত আহলে কুরআন নয়। বরং তারা মিথ্যাবাদী, কুরআনের শত্রু। কারণ কুরআন হাদীস অনুসরণ করার আদেশ করেছে, রাসূলের অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছে। আর যে সুন্নাহ অস্বীকার করে, সে কুরআনকেই অস্বীকার করে। যে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, সে প্রকৃতপক্ষে কুরআনের বিরুদ্ধাচরণ করে। আসলে তারা আহলে কুরআন নয়, তারা কুরআনের বিপক্ষ শক্তি। মূলহিদ ও যিনদীক তথা নাস্তিক। তারা পথভ্রষ্ট, বরং তারা সর্বসম্মতভাবে কাফের। (মাজমাউ ফাতাওয়া, ইমাম বিন বায, ২৩/৫৫)

উপরোক্ত সকল উলামায়ে কিরামের আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে কবুল করার পরে হাদীসে নববীকে অস্বীকারের কোন উপায় নাই। যারা হাদীসে নববীকে অস্বীকার করবে, তারা নিঃসন্দেহে দ্বীন ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে।

উপসংহার

চতুর্দশ শতাব্দী থেকে নব্য আহলে কুরআন কর্তৃক সমগ্র হাদীস অস্বীকারের যে ফিতনা শুরু হয়েছে, তা বর্তমানে সমগ্র যায়গায় ছড়িয়ে পরেছে। এতদাসত্ত্বেও, পূর্ববর্তী উলামায়ে কিরাম থেকে শুরু করে বর্তমানের উলামায়ে কিরাম এই ফিতনার খণ্ডনে যে উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার আঞ্জাম দিয়েছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবীদার। এই থিসিসে আহলে কুরআনের পরিচয়, তাদের স্বরূপ ও তাদের নীতিমালা আলোচনা করা হয়েছে। একই সাথে কিভাবে আংশিক হাদীস অস্বীকারের ফিতনা চতুর্দশ শতাব্দীতে সমগ্র হাদীস অস্বীকারের ফিতনায় পরিণত হয়েছে এবং কুরআনুল কারীম থেকে হাদীসে নববীর প্রামাণিকতা আলোচনা করে হয়েছে। একই সাথে তাদের কিছু প্রধান প্রধান সংশয়ের জবাবও দেয়া হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে যে দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করার পরে প্রত্যেক মুসলমানের রাসূলের আনুগত্য ও ইত্তেবা বা অনুসরণ করা উচিৎ। অন্যথায় উলামায়ের কিরামের স্পষ্ট ফাতওয়া আছে যে, যারা হাদীসে নববীকে অস্বীকার করে তারা নিঃসন্দেহে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গেছে।

তথ্যসূত্র

১) কুরআনুল কারীম

২) হাদীসে নববী

৩) কুরআন মানতে হলে হাদীস মানতেই হবে – মাওলানা আদুল হাকীম

৪) হাদীস মানতেই হবে – শায়খ ইমদাদুল হক

৫) হুজ্জিয়াতে হাদীস – আল্লামা মূফতি মুহাম্মাদ তাক্বী উসমানী (হাফি.)-এর বঙ্গানুবাদ হাদীসের প্রামাণ্যতা – মূফতি মুহিউদ্দীন কাসেমী।

৬) মাকতাবাতে শামেলা।